শব্দ সংস্কৃতির ছোবল

জহুরী

শব্দ-সংস্কৃতির ছোবল

জহুরী

পরিবেশনায়

তাসনিয়া বই বিতান

www.pathagar.com

শব্দ-সংস্কৃতির ছোবল

প্রকাশক
আলহাজ মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
খাজানগর, জগতি
কুষ্টিয়া

সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
মে, ২০০০ ইংরেজি সাল
বৈশাখ, ১৪০৭ বাংলা সাল
মহররম, ১৪২১ হিজরী সাল

কম্পোজ
তাসনিয়া কম্পিউটার

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরীষ দাস লেন,
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ইব্রাহিম মণ্ডল

মূল্য
৪০.০০ টাকা

www.pathagar.com

লেখকের কথা

অপসংস্কৃতি ভয়ংকর এক আজদাহার রূপ নিয়ে আমাদের বৃহদাংশকে প্রায় গিলে ফেলেছে। অনেকে জেনে-শুনে আবার অনেকে না জেনে ও বেখেয়ালে হয়েছেন এর খোরাক। যারা এখনও এই আজদাহার গ্রাসে যাননি, গ্রাসের শিকার হওয়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তারা জানেন না, শব্দ-সংস্কৃতি কিভাবে তাদের ছোবল মারছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। কোন্ কোন্ শব্দকে বাহন করে শব্দ-সংস্কৃতি আমাদের নিরন্তর ছোবল মারছে, তা জানা না থাকলে এই আজদাহার মুকাবিলা যেমন সম্ভব হবে না, তেমনি আত্মরক্ষাও করা যাবে না।

'শব্দ-সংস্কৃতির ছোবল' এই পুস্তকখানা লেখার ইচ্ছা করেছিলাম ১৯৮৫ সালে। কিন্তু তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বার বার বাধার সম্মুখীন হই। কখনো কখনো আগ্রহে ভাটাও পড়ে। অন্য প্রোগ্রামের দিকে ঝুকে পড়ি। ফলে আগ্রহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, তবে সন্ধানী চোখ কখনো একেবারে বন্ধ করিনি। যখনই কোন তথ্য পেয়েছি, সংগ্রহ করে ফাইলে আটকিয়ে রেখেছি। দীর্ঘ দিনের সংগ্রহের ফসল এই 'শব্দ-সংস্কৃতির ছোবল' পুস্তকখানা।

শব্দ-সংস্কৃতি ছোবল মারছে আমাদের বুলিতে আর লেখায় নিরন্তর। এই ছোবল থেকে হাজারে দু'একজন হয়তো রক্ষা পাচ্ছেন, কিন্তু বাদবাকি সকলেই এই ছোবলের শিকার। যে দু'একজন এই ছোবল থেকে হেফাজতে আছেন, তারা কতদিন নিজেদের হেফাজত করতে পারবেন, তাতে সন্দেহ রয়েছে।

প্রথম মুদ্রণে পুস্তকটির পরিপূর্ণ রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি পরবর্তী মুদ্রণে কলেবর হয়তো বাড়বে। বর্তমান মুদ্রণের পরিশিষ্টে উল্লেখিত শব্দসহ যে সব শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছি, এই শব্দগুলোর ব্যবহারে যদি আমাদের ঈমানী সচেতনতা সৃষ্টি হয়, তাহলে আমাদের জবান ও লেখার ভাষা অপসংস্কৃতি মুক্তই শুধু হবে না, আমরা ছোট-বড় গুণাহ থেকেও বাঁচবো।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের মুখপত্র 'ছাত্র সংবাদ'-এ অধিকাংশ শব্দের আলোচনা চার সংখ্যায় প্রকাশিত হয় জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলামের বিশেষ আগ্রহে। তিনি লেখাগুলো তাগাদা দিয়ে আমার থেকে আদায় করে নেন। পুস্তক আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে জনাব নূরুল ইসলাম এবং তাসনিয়া বই বিতানের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রবের সক্রিয় ভূমিকা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই গুণাহগারের শ্রম আল্লাহ পাক কবুল করুন। আমিন।

জহুরী

স্থায়ী ঠিকানা	যোগাযোগের ঠিকানা
গ্রাম ও ডাকঘর-কদমরসুল	৪২৩, ওয়্যারলেস রেলগেট
থানা-গোলাপগঞ্জ	বড় মগবাজার
জেলা-সিলেট	ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

হে রাব্বুল আলামীন,

আমার আম্মা ও আব্বার রূহের মাগফিরাতের আশায় এই ক্ষুদ্র নজরানা নিয়ে আপনার রহমতের দ্বারে ভিক্ষুকের মতো হাজির হয়েছি।

আপনি এই নজরানা কবুল করে নিন। আমার আম্মা-আব্বাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন।

গুণাহগার

জহুরী

www.pathagar.com

'শব্দ-সংস্কৃতির ছোবল' পুস্তকখানা বাংলা ভাষাভাষী সকল মুসলমানের জন্য লেখা হয়েছে-

- যে সব মুসলিম তরুণ লেখক লেখালেখি শুরু করেছেন

- যারা লেখালেখি শুরু করেননি, শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন

- যারা প্রবীণ লেখক ও বক্তা অথচ তারা লেখালেখিতে ও বক্তৃতায় প্রায়ই অপসংস্কৃতিমূলক শব্দ ব্যবহার করেন, অথচ জানেন না এসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ইতিহাস অথবা জানলেও এদিকে খেয়াল করেন না

- যারা অপসংস্কৃতিমূলক শব্দ ঘৃণা করেন অথচ ব্যবহার করেন আগ্রহ সহকারে শয়তানের ওয়াসওয়াসে

- যারা ইচ্ছা করে স্বধর্ম ও স্বকীয় সংস্কৃতি ত্যাগ করে পরকীয়া সংস্কৃতিতে লীন হতে যাচ্ছেন

- যারা বেখেয়ালে সর্বদা ভুল করছেন, তাদের বেখেয়ালের ভুল সংশোধনের জন্যও এই বই।

মোট কথা, সকল বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের জন্য এবং আমার জন্যও এই বই। আমিও অতীতে এমন অনেক ভুল করেছি।

জহুরী

www.pathagar.com

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
শব্দ-সংস্কৃতির ছোবল	... ৭
অগ্নিকন্যা/অগ্নিপুরুষ	... ১১
অর্ঘ্য	... ১৩
অপ্সরা বা অপ্সরী	... ১৪
অ্যাংকেল/অ্যান্টি	... ১৪
আগে আল্লাহ বাদে আপনি	... ১৬
আচার্য/উপাচার্য	... ১৭
আপামর	... ১৯
আলিঙ্গন	... ২১
আবাহনী/আবাহন	... ২২
উৎসর্গ	... ২২
উপাস্য	... ২৬
একেশ্বরবাদ	... ২৭
এলাহিকাণ্ড	... ২৯
ঐশীবাণী/ঐশীশক্তি	... ৩০
কীর্তন	... ৩০
জয়ন্তী	... ৩১
জলাঞ্জলী	... ৩৩
জীবন রক্ষাকারী ওষুধ	... ৩৫
তীর্থযাত্রী/তীর্থযাত্রা	... ৩৬
তিলোত্তমা	... ৩৮
তুলসী পাতা/ধোঁয়া তুলসী পাতা	... ৩৯
তুঘলকি কাণ্ড	... ৪০
দৈববাণী	... ৪৬
প্রজন্ম	... ৪৭
প্রয়াত	... ৪৯
বেদী	... ৫২
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড	... ৫৩
বিসমিল্লায় গলদ	... ৫৪
বিদ্যাপীঠ	... ৫৫
ভাবমূর্তি	... ৫৬
ভেস্ত/হদিস	... ৫৭
মধ্যযুগীয় বর্বরতা	... ৫৯
মানুষের ভুল আছে... নেই	... ৬৪
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা	... ৬৪
মুখে ফুল চন্দন পড়ুক	... ৬৭
মহাভারত কি অশুদ্ধ...?	... ৬৭
যক্ষের ধন	... ৬৮
লক্ষ্মী	... ৬৯
লীলা	... ৭১
সূর্যসন্তান	... ৭২
সতী সাধ্বী	... ৭৩
সতীর্থ	... ৭৪
স্নাতক	... ৭৪
হরিলুট	... ৭৪
হত্যাযজ্ঞ	... ৭৫
হন্যা/হন্যে	... ৭৫
পরিশিষ্ট	... ৭৭
উপসংহার	... ৭৮

www.pathagar.com

শব্দ-সংস্কৃতির ছোবল

Aggression ইংরেজি ভাষার একটি শব্দ। বাংলা ভাষায় এই ইংরেজি শব্দের যতো প্রতিশব্দ আছে, তন্মধ্যে আগ্রাসন শব্দটি শুধু যুৎসই-ই নয়; সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যও বটে। ইংরেজি এ্যাগ্রেশন আর বাংলা আগ্রাসন, দুই ভাষার দুই শব্দের একই অর্থ, একই ছন্দ, অপূর্ব মহামিলন, যেন সোনায় সোহাগার মিলন।

এই এ্যাগ্রেশন আর আগ্রাসনের মধ্যে ছন্দের, অর্থের, ভাব ও ব্যঞ্জনার মহামিলন। এ দুয়ের যে কোন একটি যখন অপরের উপর চড়াও হয়, তখন ভীষণ হিংস্ররূপ ধারণ করে। এদের অবশ্য নিজস্ব কোন শক্তি বা রূপ নেই, অন্যকে বাহন বানিয়ে বাহাদুরী করে। অর্থনীতিকে বাহন করে অর্থনৈতিক আগ্রাসন চালায়, রাজনীতিকে বাহন করে চালায় রাজনৈতিক আগ্রাসন। অনুরূপভাবে সংস্কৃতিকে বাহন করে চালায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন!

আগ্রাসনের ক'খানা মুখ, ক'খানা হাত, ক'টি পা আর ক'টি চোখ রয়েছে, তা নিরূপণ করা মুশকিল। আগ্রাসনের যেমন নানা বাহন আছে, তেমনি আছে নানা হাতিয়ার। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই আগ্রাসন সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ও সচল। এ ক্ষেত্রে এর সাফল্য শতভাগ। কারণ, এ সংস্কৃতি সম্মোহনের একটা জাল ফেলে প্রথমে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে। অতঃপর সম্মোহনে সম্মোহিত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতির ওপর চালায় সাংস্কৃতিক অপারেশন। জাতির মধ্যে তখন কোন বোধ বা চেতনা থাকে না। যেমন এনেসথেশিয়া প্রাপ্ত মানুষের গোটা দেহ কেটে টুকরা টুকরা করলেও রোগী আহ্ উহ্ শব্দ করতে পারে না। কারণ, সে অনুভূতিই থাকে না। তেমনি সংস্কৃতির আগ্রাসনের অপারেশন যাদের ওপর দিয়ে চলে, তাদের অনুভূতি আর চেতনা কণামাত্র থাকে না। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন তখন তার বিবিধ হাতিয়ার থেকে যখন যেটা

www.pathagar.com

প্রয়োজন তা ব্যবহার করে। এ আগ্রাসনের একটি হাতিয়ারের নাম হলো শব্দ-সংস্কৃতি।

বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরা, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানরা শব্দ-সংস্কৃতির আগ্রাসনের নির্মম শিকার। এই উপমহাদেশ ভাগ হওয়ার পর থেকে ওপার বাংলার সংস্কৃতি-বাবুরা এপার বাংলার মুসলিম নামের বাবু-মনাদের বাহন করে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালাতে থাকে। তারা কিছুটা সক্ষমও হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় ব্যর্থ। তারা যতটুকু সফল হয়, ততটুকু নিখুঁত ও মজবুতভাবেই সফল হয়, স্বল্প সংখ্যক বীজ অংকুরিত হয়ে কিশলয়ে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে মহীরুহের পূর্ণতা লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর অতীতের সব ব্যর্থতার বাধা দূর হয়ে যায়। ওপারের বাবু-সংস্কৃতির আগ্রাসনের কালো ঘোড়া লাগাম ও সহিসবিহীন অবস্থায় এপার বাংলার সর্বত্র সফর করে রাজধানীতে অবস্থান নেয়। ওপারের সংস্কৃতি-বাবুরা তাদের অনুগত এপারের সেবাদাস ও দাসীদের সহযোগিতায় এতদিনের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে লেগে যায়। আগে যা সাফল্য তারা লাভ করেছিল, এর সঙ্গে নতুন উদ্যোমে গোটা নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে সচল করে তোলে। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায়। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সামাজিকতা ও ভাষাসহ বহুক্ষেত্রে একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায়। ভাষার মধ্যে শব্দ-সংস্কৃতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, একে তারা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। আমি বলবো, তাদের প্রচেষ্টা সফল। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে হোক অথবা অসাম্প্রদায়িক হওয়ার এলার্জি থাকার কারণেই হোক, তাদের শব্দ সংস্কৃতিকে অনেকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। যারা গ্রহণ করে নিয়েছেন, তাদের মধ্যে বাবু-সংস্কৃতির দর্শনপন্থীরা তো রয়েছেন, তারা তো থাকবেনই। কারণ, উদ্যোক্তারা বাদ থাকেন কেমন করে? যারা এই বাবু-সংস্কৃতির বিরোধী, তারাও মনের অজ্ঞাতে অজান্তে সেই জালে আটকা পড়ে তাদের 'শব্দ সংস্কৃতি' অনুসরণ ও অনুকরণ করছেন। এ তালিকায় আছেন এমন অনেক, যাদের নাম শুনলে বিশ্বাসই হয় না যে, তারা এই

www.pathagar.com

দর্শনের শব্দ-সংস্কৃতি অনুসরণ করতে পারেন। আমার এ আলোচনা তাদের ভুল শোধরিয়ে দেয়ার জন্য। সাথে সাথে মুসলিম নবীন লেখকদেরও সচেতন করে তোলা, যাতে তারা নিজেদের লেখায় অপসংস্কৃতিমূলক শব্দ ব্যবহার না করেন। সাধারণ আলাপচারিতায়ও সতর্কতার সাথে আমাদের কথা বলতে হবে। মাহফিলে-মজলিশে, সেমিনারে-সিম্পোজিয়ামে আর ছোট-বড় সভা-সমিতিতে যারা বক্তব্য রাখেন, তাদেরও শব্দ প্রয়োগে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে তাদের জবানে অপসংস্কৃতিমূলক কোন শব্দ বের হয়ে না যায়। আমার এ আলোচনা সাধারণভাবে প্রত্যেক বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের জন্য, তবে বিশেষ করে মুসলিম লেখক ও বক্তাদের জন্য। আমিও অতীতে অপসংস্কৃতিমূলক অনেক শব্দ না জেনে ব্যবহার করেছি। এ জন্য এখন অনুতাপ করি। সাধ্য মতো শুধরিয়ে নিচ্ছি। যা শোধরানো সম্ভব নয়, এ জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাই, তিনি যেন মাফ করে দেন।

তবে অপসংস্কৃতিমূলক শব্দ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান আংশিকভাবে হলেও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলছেন। যেমন বাংলাদেশের অনেক এলাকায় ও জনপদে একই ভাষাভাষী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক বাস করেন। তারা একই ভাষায় একে অন্যের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করে থাকেন। এমনকি এলাকাভিত্তিক সামাজিক অনুষ্ঠানও এক সাথে করেন। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে, একই ভাষায় কথা বলা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ নিজ নিজ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে থাকেন। সুখে-দুঃখে-আবেগে ও প্রয়োজনে কেউ বলছেন 'আল্লাহ', কেউ বলছেন 'ভগবান', কেউ বলছেন 'পানি', কেউ বলছেন 'জল'। মোট কথা, অভিন্নতার মধ্যেও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার সুস্পষ্ট আলামত লক্ষ্য করা যায়। হাজার বছর পাশাপাশি বাস করার পরও সাংস্কৃতিক পার্থক্য রেখা এখনও মুছে যায়নি। তবে একটি কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সম্প্রতি পরকীয়া শব্দ-সংস্কৃতির বেশ কিছু প্রভাব মুসলমানদের ওপর পড়েছে। কিন্তু মুসলমানদের শব্দ-সংস্কৃতির প্রভাব ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপর প্রায়ই পড়েনি। বাংলাদেশের মুসলমানরাই প্রথমে আগ্রহ সহকারে হিন্দু নাম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোন হিন্দু পরিবার কখনো

www.pathagar.com

মুসলমানী নাম গ্রহণ করেছেন এমন কোন নজীর আছে বলে আমি জানি না। আমাদের মধ্যে যারা অপসংস্কৃতি বিরোধী বলে দাবি করেন, তাদের মধ্যে অনেকে আছেন, অপসংস্কৃতিকে সমালোচনা করতে গিয়ে লেখায় বা বক্তৃতায় কখনও কখনও এমন শব্দ ব্যবহার করেন, যা অবচেতন মনে বা অজ্ঞতার কারণে অপসংস্কৃতিমূলক শব্দকেই গ্রহণ করে নেন। একবার এক সংস্কৃতি সেমিনারে জনৈক বক্তা তার ১০ মিনিটের বক্তৃতায় ৬ বার 'ভাবমূর্তি' শব্দটি উচ্চারণ করেন, অথচ তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ইসলামী সংস্কৃতির ওপর। বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআন ও হাদীসের যে সব তরজমা ও তফসির প্রকাশিত হয়েছে, তাদের প্রায় সব ক'টিতে অপসংস্কৃতিমূলক অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন উপাস্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তীর্থ, উপাসনা, ঐশীবাণী, দৈববাণী ইত্যাদি। ভিন শব্দ-সংস্কৃতির প্রভাব মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। আমার এই দুর্বল কলম দ্বারা এই স্রোতের মুকাবিলা করা কতটুকু সম্ভব তা আমি ভালভাবে বুঝি, তবুও ভরসা এই, যদি আল্লাহ্ আমার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন, নেক প্রচেষ্টার ওপর রহমত বর্ষণ করেন, এই লেখার পাঠকদের মধ্য থেকে ক্ষুদ্র একটি অংশকেও যদি তিনি হেদায়াত করেন, তাহলে মনে করবো আমার প্রচেষ্টা সফল। এবার আমরা দেখি, কোন্ কোন্ শব্দ এক একটি বিষধর স্বর্প হয়ে আমাদের ঈমান-আক্বিদায় ছোবল মারছে।

www.pathagar.com

অগ্নিকন্যা/অগ্নিপুরুষ

পবিত্র কোরআন ও হাদীস আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে মানুষ আগুনের তৈরি নয়, মাটির তৈরি, শয়তান জাতি আগুনের তৈরি। মুসলমানদের মৃত্যুর পর তাকে মাটির কবরে সমাহিত করা হয়। মাটির দেহ মাটিতে মিশে যায়। এ জন্য মুসলমানরা কোন মুসলিম লাশকে আগুনে পোড়ায় না। আগুনকে আমরা ব্যবহার করি প্রয়োজনে। যাকে বলে ব্যবহারের প্রয়োজনে ব্যবহার। আগুনকে আমরা পূজা করি না, এই 'আগুন' নামের প্রতি আমাদের কোন মোহ নেই। মুসলমানদের মধ্যে কোন অগ্নিপূজারী নেই। মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসে নেই কোন অগ্নিদেবতা বা অগ্নি অবতার। সুতরাং আগুনকে এবাদতের বস্তু জ্ঞান করে আগুনের বৈশিষ্ট্যকে এবং তার প্রকৃতিকে মানব চরিত্রে চরিত্রায়ন করে আমাদের কেউ অগ্নিকন্যা বা অগ্নিপুরুষ হতে পারেন না। এমনকি তা হওয়ার অভিনয় করাও বেদায়াত। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, আগ্নিকে আমরা ভাল অর্থে অগ্নি-প্রকৃতি বা এর তেজকে বিক্রমের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে থাকি, এতে দোষের এমন কি আছে? এ জিজ্ঞাসার জবাবে আমার কথা হলো, অবশ্যই দোষের আছে। মানব চরিত্রের তেজস্বিতা আগুনের সাথে তুলনা করার মতো নয়, তা তুলনাও করা যায় না। এমনকি অগ্নি উপাসকরা অগ্নিকে পূজা করে একটি শক্তি জ্ঞান করে, কিন্তু পূজার আগুনে কখনো ভুলেও হাত দেয় না। মুসলমানদের ঈমান হচ্ছে এই, আল্লাহ পাক মাটির যে দেহে ঈমানের নূর দিয়েছেন, সেই নূরের তজল্লীতে নমরুদের অগ্নিকুণ্ডের আগুনও দাহ্য-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, নূরধারী দেহ অক্ষত থাকে। দোযখের আগুনও তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। এমন একটি দ্বীনের ঈমানে 'অগ্নিকন্যা' আর 'অগ্নিপুরুষ'-এর সহ অবস্থান কি

www.pathagar.com

যৌক্তিক, না সম্ভব? আমরা জাহান্নামের আগুন থেকে পানাহ চাই। সেই আগুনের খাস্‌লত চরিত্রে ধারণ করে আমরা হতে চাই না 'অগ্নিকন্যা', 'অগ্নিপুরুষ' এমনকি কঠিন পরীক্ষার নামে অবতীর্ণ হতে চাই না কোন 'অগ্নিপরীক্ষা'য়ও। 'অগ্নিশর্মা' হওয়ারও প্রয়োজন নেই। শর্মা ব্রাহ্মণের উপাধি। তাই মুসলমান 'অগ্নিশর্মা' কেমন করে হতে পারে? শিখা অনির্বাণ আর শিখা চিরন্তন নামে গ্যাস পোড়ানো অগ্নিপূজারই বাংলাদেশী সংস্করণ। এই অপচয়ের উদ্যোক্তারা ও পৃষ্ঠপোষকরা শয়তানেরই ভাই ও বোন।

অগ্নিকে আমরা অনেক নামে চিনি। যেমন আগুন, অনল, বহ্নি, পাবক, হুতাশন, বৈশ্বানর। হিন্দু শাস্ত্র মতে, ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র ও দক্ষ কন্যা স্বাহার স্বামী অগ্নি অবতারও বটে। দশটি দিকের মধ্যে অগ্নিকোণ বলতে যে কোন্‌টি আছে (পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ), এই কোণের একজন অধিদেবতা আছেন, তিনি অগ্নিদেব, তার নাম বৈশ্বানর। বেদে আছে তিন প্রকার অগ্নির নাম, গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণ। অগ্নিদাতা সেই পুরুষকেই বলে, যে মরদেহে মুখাগ্নি করে। যে নারী মুখাগ্নি করে সে অগ্নিদাত্রী। সাগ্নিক ব্রাহ্মণের করণীয় বৈদিকযজ্ঞ বিশেষ হচ্ছে অগ্নিষ্টোন আর সাগ্নিকের করণীয় প্রাত্যহিক হোম হচ্ছে অগ্নিহোত্র।

দেবতা বা ব্রাহ্মণের মুখকে বলে অগ্নিমুখ। এই শাস্ত্রে কার্তিকেয়কে বলে অগ্নিকুমার। হিন্দু শাস্ত্র মতে গোটা পৃথিবী একটি অগ্নিকুণ্ড। এবার বলুন, আমরা কি এই দর্শন অনুসরণ করে আগুনের মতো তেজস্বিনী কন্যা আর তেজস্বী পুরুষকে অগ্নিকন্যা ও অগ্নিপুরুষ বলতে পারি? হযরত আদম (আঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করেনি ইবলিস যে সব কারণে, তন্মধ্যে প্রধান কারণটি ছিল এই, সে বলেছিল, আমি আগুনের তৈরি আর আদম হলো মাটির তৈরি।

মুসলমানদের মধ্যে যারা অগ্নিকন্যা বা অগ্নিপুরুষ হতে চান বা যারা মুসলিম সমাজে অগ্নিকন্যা বা অগ্নিপুরুষ সৃষ্টি করতে আগ্রহী, উভয়পক্ষের ঈমানের বা বিবেকের পর্দায় কিছু কথার ছায়া ফেললাম এতক্ষণ। আল্লাহ যদি এই ছায়াকে কবুল করে নেন, তাহলে তা কায়ায় রূপান্তরিত হতে পারে।

www.pathagar.com

'ঈমানের পরীক্ষা' যেখানে যথেষ্ট, সেখানে 'ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা' লেখা মানে ঈমানকে আগুনের কাছে নিয়ে যাওয়ার নামান্তর। বীণাকেই যখন গ্রহণ করি না, তখন অগ্নিবীণা বা স্বর্ণবীণা হলেই কি? অনেকে বলবেন 'বেশি বাড়াবাড়ি', কেউ বলবেন 'সংকীর্ণতা', আমি বলি, যে যাই বলুন, ঈমান আর তাকওয়ার প্রশ্নে যে কোন গালি বা মন্তব্য শুনতে রাজি আছি, কিন্তু নিজের অবস্থান থেকে মোটেই নড়ছি না। হ্যাঁ, এর ফয়সালা আছে। প্রমাণ করতে হবে আমার কথা ভুল। প্রমাণ করতে না পারলে আমার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যে সঠিক তা মেনে নিতে হবে। এটাই ফয়সালার একমাত্র শর্ত।

অর্ঘ্য

অর্ঘ্য শব্দের সাথে ইসলামী সংস্কৃতির কোন দূরতম সম্পর্ক নেই। অর্ঘ্য হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজার উপকরণ এবং উপকরণ নিবেদনের কায়দা-কানুন। হিন্দু শাস্ত্র মতে, হিন্দুরা যাকে সম্মানিত ব্যক্তি মনে করেন, তাকে বরণ করার জন্য মালা চন্দনাদি দ্বারা বরণের উপাচারসহ অর্ঘ্য নিবেদন করে থাকেন। দেবতার মূর্তিকেও তারা বিভিন্নভাবে অর্ঘ্য নিবেদন করে থাকেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কলিকাতার বইমেলার অনুষ্ঠান উপলক্ষে (১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে) চন্দনাদি দিয়ে কপালে তিলক এবং সিঁথিতে সিঁদুর দ্বারা হিন্দুরা অর্ঘ্য নিবেদন করেন। হিন্দুদের ধর্মীয় আচার অনুযায়ী যে সম্মান বা পূজা নিবেদন করা হয়, তাই অর্ঘ্য। এক কথায় বলা যায়, Anything offered in homage (to) সেটাই 'অর্ঘ্য'। এবার মুসলমানরা চিন্তা করে দেখুন, আমরা যাকে সম্মান প্রদর্শন করে বরণ করবো, তাকে কি সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারি? আমরা আমাদের নিয়মে ইস্তেকবাল করতে পারি, খোশ আমদেদ জানাতে পারি, অভ্যর্থনা করতে পারি। অন্যের পূজার শব্দ কেন আমরা ব্যবহার করবো?

www.pathagar.com

অপ্সরা/অপ্সরী

দেবযোনি বিশেষ, স্বর্গ বারাঙ্গনা, সুরসুন্দরী, সহজ কথায় বলা যায় স্বর্গবেশ্যা (হিন্দু শাস্ত্র মতে)। কোন কোন মুসলিম লেখকের লেখায় সুন্দরীদের অপ্সরা সম্বোধন করতে দেখা যায়। কোন কোন মুসলিম পরিবারে মেয়ের নাম অপ্সরা রাখা হয়। মেয়ের মা-বাবা কি অপ্সরা বা অপ্সরী শব্দের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েই মেয়ের নাম রাখেন কিনা তা জানি না। তারা ঈমান-আক্বিদায় নিষ্ঠাবান হলে নামকরণের আগে ঈমানের দাবির কাছে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতেন, মেয়ের নাম ইসলামী নাম রাখতেন। এই প্রয়োজনীয়তার তাগিদ অনেক মুসলিম পরিবার থেকে বিদায় নিয়েছে।

মুসলিম আক্বিদা মতে, বেহেশতে কোন বেশ্যা নেই, আছে হুর (The Virgins Promised to muslims in Paradise)। সুতরাং বলা যায়, মুসলিম পরিবারে এ নাম শুধু হিন্দু নামই নয়, এ একদিকে ইসলামী সংস্কৃতি বিরোধী এবং অপরদিকে ঈমান-আক্বিদার সরাসরি লংঘনও বটে। অপ্সরা নামধারণ করে একটি মেয়ে কিভাবে নারী সম্ভ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারে? অতএব এ শব্দ যেমন আমরা লেখায় আনতে পারি না, তেমনি পারি না নামকরণেও।

অ্যাংকেল/অ্যান্টি

অ্যাংকেল-অ্যান্টি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ব্যাপারটা এখন এমন এক পর্যায়ে এসেছে, যা সমাজ থেকে অপসারণ করা প্রায় অসম্ভব। আমি নিজেও দিনে কয়েক বার এ সম্বোধন শুনি।

এই দু'টি সম্বোধনী শব্দ ভিন্ কোন জাতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। এ জন্য পশ্চিমা সংস্কৃতির রফতানিকারকদের দোষারোপ করা যায় না। আমরাই আধুনিক হওয়ার জন্য যেমন চালচলন, বুলিবচনে ও পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন এনেছি, নতুন নাম ধারণ করছি, তেমনি

www.pathagar.com

চাচা-চাচী, মামা-মামী, খালা-খালু, ফুফু-ফুফা সম্বোধন ছেড়ে অ্যাংকেল-অ্যান্টি গ্রহণ করেছি। এ ক্ষেত্রে 'বিশেষ অবদান' রেখেছে আমাদের বিটিভি, রেডিও, সিনেমা, নাটক ইত্যাদি। এ সব মাধ্যমের ভূমিকা মা-বাবা সম্বোধন পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে। মা-বাবা বা আম্মা-আব্বার পরিবর্তে মাম্মী, মাম, ড্যাড, ড্যাডি বহু মুসলিম পরিবারে চালু হয়ে গেছে। আমরা যে অর্থে চাচা-চাচী বা মামা-মামী সম্বোধন করি, ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা তারাও এই অর্থে নিজেদের চাচা-চাচী বা মামা-মামীকে অ্যাংকেল-অ্যান্টি সম্বোধন করে থাকেন। এদিক দিয়ে আমাদের আর তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। লক্ষণীয় দিকটি হচ্ছে এই, আমরা ওদের সম্বোধন-সংস্কৃতি গ্রহণ করলেও ওরা কিন্তু আমাদের সম্বোধন-সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি।

ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং ফ্রান্সে যারা ফেরি করে জামা কাপড় বিক্রি করতো (Fawnbroker), ক্রেতারা তাদের অ্যাংকেল বলতো। আমেরিকার কোন কোন এলাকার অধিবাসীদের অ্যাংকেল শ্যাম (Uncle Sam) সম্বোধন করা হয়। অ্যান্ট ও অ্যান্টি একই অর্থবোধক। Aunt ইংরেজদের শব্দ আর Aunty আমেরিকায় উচ্চারিত শব্দ। Aunt Sally তিরস্কারের ভাবার্থেও ব্যবহার হয়। বাংলাদেশে অ্যাংকেল-অ্যান্টি বাজারী সম্বোধন হয়ে গেছে। সমবয়সীরাও একে অন্যকে তা সম্বোধন করে থাকেন।

যে ব্যক্তি অন্য জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অনুসরণ করে, সে ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, এতো শাস্ত্রীয় কথা। যদি আমরা এ অভ্যাস ত্যাগ না করি, তাহলে সম্বোধন ও কৃষ্টিতে আমরা যে অলক্ষ্যে খ্রীস্টান চরিত্র ধারণ করবো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুসলিম লেখকদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। শুধু লেখালেখির বেলায়ই নয়, পারিবারিক অঙ্গনে পারস্পরিক সম্বোধনেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানে সতর্ক হওয়া উচিত। অনেকে তাদের মা-বাবা সম্বোধনকে ড্যাডি-মাম্মীর যুপোকাষ্ঠে 'বলি' দিয়েছেন।

যে সব পরিবারে অ্যাংকেল/অ্যান্টি, ড্যাডি-মাম্মী চালু হয়েছে, সে সব পরিবারের উঠতি বয়সের ঝি-চাকররাও এই রেওয়াজ অনুসরণ করছে। এক পরিবারে গিয়ে দেখলাম, মধ্যম বয়সী এক মহিলা, যাকে আমি চিনি না এবং

www.pathagar.com

আর কখনো দেখিনি। ১০/১২ বছরের এক মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইনি কে'? জবাবে বালিকাটি বললো, চিনলেন না? ইনি আমার অ্যান্টি। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, সে তো বুঝলাম তোমার অ্যান্টি, তোমার মামী, খালা, ফুফু না চাচী? মেয়েটি বললো, তা আমি জানি না। মা বলছেন অ্যান্টি বলতে, তাই অ্যান্টি বলি। যা হোক, মেয়েটির মা এসে সম্পর্ক পরিচিতি বলে দিলেন। আর এক বাসায় গিয়ে শুনি একই সম্বোধন। বোন সম্পর্কীয়া এক কিশোরীকে বাসার একটা শিশু বার বার অ্যান্টি বলছে, মা বাধা দিচ্ছেন, কিন্তু শিশু বাধা মানে না। কারণ, এই বাসায় এ সম্বোধন ছাড়া আর কোন সম্বোধনই নেই। তাই শিশু জানে অ্যান্টি, সম্বোধনও করছে তাই। আল্লাহ আমাদের এই কালচার থেকে মুক্তি দিন।

আগে আল্লাহ বাদে আপনি——

কেউ কেউ বলেন, 'উপরে আল্লাহ জমিনে জনগণ', উভয় কথার একই অর্থ। ধার্মিক মুসলিম নর-নারীও এমন কথা বলেন। তারা বুঝে বলেন বা না বুঝে বলেন, তা তারাই জানেন। আমার মনে হয়, অনেকে বুঝে বলেন না। বুঝে যদি বলতেন, তাহলে এমন কথা বলতেন না। যে আল্লাহ আগে থাকতে পারেন, তিনি বাদেও থাকতে পারেন। উপরের আল্লাহ জমিনেও আছেন। আল্লাহ সর্বত্র, তিনি সর্বত্র বিরাজিত। আমাদের প্রতি দমে দমে তার অস্তিত্বই আমরা টের পাই। আমাদের কণ্ঠনালী যতো কাছে, আল্লাহ তার চেয়েও কাছে। গোটা সৃষ্টির ওপর তার একক সার্বভৌমত্বের অধিকার রয়েছে। তার জানার ও নজরের বাহিরে কিছুই নেই এবং কিছুই ঘটে না। যদি আমরা ঈমানের সাথে এই মহাসত্যকে স্বীকার করে নেই, তাহলে ঈমান অনুযায়ী বাক্য সংশোধন করে বলতে হবে 'আগে আল্লাহ বাদেও আল্লাহ', 'উপরে আল্লাহ জমিনেও আল্লাহ'। এ সত্য জানার পর যারা পুরনো অভ্যাস মতো উচ্চারণ করবেন, তারা শিরকের মতো গুণাহ করবেন।

www.pathagar.com

আচার্য/উপাচার্য

ওপার বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং ভাইস চ্যান্সেলরকে আচার্য এবং উপাচার্য বলা হয়। তারা অবশ্যই তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং ভাইস চ্যান্সেলরকে আচার্য-উপাচার্য বলতে পারেন। কিন্তু মুসলমানরাও কি মুসলিম সমাজে তা বলতে পারেন? মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি অনুযায়ী এ সম্বোধন কি করা যায়? না, আমরা পারি না। পারি না এ জন্য যে, এ সম্বোধন আমাদের সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। পরিতাপের বিষয়, আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলরকে এ সম্বোধনই করে আসছি। কারণ একটাই, আর তা হচ্ছে এই, দাদা বাবুরা করেন, তাই আমরা করি। আমাদের দেশে যারা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, ওদের আর তাদের সাংস্কৃতিক উৎস হয়তো এক ও অভিন্ন। সুতরাং একই শব্দ ব্যবহারে বরং উৎসাহ বোধ করবেন। আমরা যারা এই শব্দ ব্যবহারের বিরোধিতা করি, আমাদের তারা প্রশ্ন করেন, তাহলে চ্যান্সেলর এবং ভাইস চ্যান্সেলরের বাংলা তরজমা এমন কি আছে, যা আমরা গ্রহণ করবো? আমাকে এ প্রশ্ন করেছিলেন একজন পাঠক। আমি উত্তরে লিখেছিলাম, কেন আপনি তরজমার জন্য এত পেরেশান? তরজমা ছাড়াই তো অনেক কিছু গ্রহণ করে নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রেও বিনা তরজমায় অরিজিন শব্দ গ্রহণ করলে দোষ কি? যেমন কুরমা, কালিয়া, পোলাও, রেজালা, বুরহানি, রোস্ট, জর্দা, ফিরণী, পায়াশ, নেহারি, হালিম খাচ্ছেন। একটি আইটেমও তরজমা করে খান না। কোট, প্যান্ট, পাজামা, পাঞ্জাবি পরিধানেও তরজমার প্রয়োজন বোধ করেন না। চেয়ার, টেবিল, কাগজ, কলম ব্যবহারেও দরকার পড়ে না তরজমার। শুধু এ শব্দগুলোই নয়, এমন হাজার হাজার শব্দ ব্যবহার করছেন তরজমা ছাড়া, আমাদের ভাষার সাথে এগুলো একাকার হয়ে গেছে। এসব যদি তরজমা ছাড়া চলে, তাহলে চ্যান্সেলর আর ভাইস চ্যান্সেলর ব্যবহার কেন চলবে না? নিজের নামই তো তরজমা ছাড়া ব্যবহার করছেন। নিজের নাম নূরুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের আলো বা নূর। আপনার পত্রে তো আপনার নাম

www.pathagar.com

তরজমা ছাড়াই দেখলাম। একই ফর্মূলায় চ্যান্সেলর/ভাইস চ্যান্সেলর থাক্ না। বিদেশে মানুষ আচার্য চিনে না, চিনে চ্যান্সেলর।

আমার এ পত্রের কোন জবাব ঐ পাঠক থেকে পাইনি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, নতুন শব্দ ব্যবহারে আপত্তি তো থাকার কথা নয়, আপত্তির কারণ তখনই সৃষ্টি হয়, যদি শব্দের ব্যবহার আমাকে স্বকীয় সংস্কৃতি থেকে দূরে সরাতে চায়, আমার ঈমান-আক্বিদাকে আঘাত করে, তাহলে তা আমি গ্রহণ করতে পারি না।

আচার্য শব্দের অর্থ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গ্রহবিপ্র, বৈদাধ্যাপক, শিক্ষাগুরু। বৈদিক যুগে হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্রভিত্তিক শিক্ষালয়ের শিক্ষকদের আচার্য বলা হতো। তারা বৈদিক ধর্ম শিক্ষা দিতেন। অন্য এক তথ্যে জানা যায়, যিনি যে কোন শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করে অনুরূপ আচরণ করতেন, তাকেও সে আচরণের 'আচার্য' বলা হতো। এই আচরণের মধ্যে শাস্ত্রীয় (বৈদিক শাস্ত্র) শিক্ষাদানই প্রধান। হিন্দুদের শিক্ষা গুরুর পদ বা আসনের নামই আচার্যের আসন। যিনি শিষ্যকে বা শিষ্যদের বেদ পড়াতেন, তিনি আচার্য হিসেবে পরিচিতি হতেন। হিন্দুদের পূজা-পার্বনের মূল আসনে বসে যিনি পূজা-পার্বন সম্পন্ন করেন, তিনিও আচার্য। তার স্ত্রী আচার্যা বা আচার্যানী।

এবার চিন্তা করে দেখুন তো, আচার্য/উপাচার্য পদ পদবী বা সম্বোধন মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য কিনা? যার মধ্যে ঈমানের কণামাত্র অবশিষ্ট আছে এবং স্বকীয় সংস্কৃতির প্রতি কিছুটাও ভালোবাসা আছে, তিনি কি পারেন পর ধর্মের ধর্মীয় পদকে বরণ করে নিতে? ওরা ভাষার জাল ফেলে সংস্কৃতির বড়শী দিয়ে আমাদের বিদ্ধ করে আচার্য সংস্কৃতিতে দীক্ষা নিতে বাধ্য করেছে, আর আমরাও দীক্ষা নিয়ে যেন নিজেদের ধন্য করছি। তরুণ নওজোয়ান মুসলমানরাই পারেন এই অপসংস্কৃতির শিকড় উৎপাটন করে এ দেশের মুসলমানদের ঈমানের হেফাজত করতে। চ্যান্সেলর/ভাইস চ্যান্সেলর শব্দের মধ্যে অপসংস্কৃতির দুর্গন্ধ বা গন্ধ কোনটাই নেই, কিন্তু আচার্য/উপাচার্য শব্দের বাহিরে-ভিতরে অপসংস্কৃতির রক্ত-মাংস এবং উৎকট দুর্গন্ধ রয়েছে।

www.pathagar.com

আপামর

এই শব্দটিকে মুসলমানরা কোন বিবেচনায়ই গ্রহণ করতে পারেন না। কেন পারেন না, তা ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যাবে। আ+পামর অর্থাৎ পামর পর্যন্ত। উচ্চ-নীচ অভেদে সকলে। আপামর ক্রিয়া বিশেষণ আর পামর হচ্ছে বিশেষণ। পামর অর্থ হচ্ছে পাপিষ্ঠ, নরাধম, মূর্খ, নীচ। জনসাধারণকে বোঝানোর জন্য বর্তমানে আপামর শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্বভাবত প্রশ্ন জাগে, জনসাধারণ কি পাপিষ্ঠ, নরাধম, মূর্খ ও নীচ? কেন, কখন আর কোন্ প্রেক্ষাপটে পামর শব্দের ব্যবহার শুরু হয়, তা জানলেই আমরা বুঝতে পারবো, মুসলমানরা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায়, বক্তৃতায় ও লেখায় 'আপামর' শব্দ ব্যবহার করতে পারেন কিনা।

ইতিহাসে যারা আর্য বলে পরিচিত, তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেই দেখে এমন এক জাতির বাস, যারা কৃষ্ণকায়। আর্যরা ছিল গৌরকান্তি, দীর্ঘকায় এবং তাদের নাসিকা ছিল উন্নত। বর্তমানের ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে এমন আকৃতি সম্পন্ন মানুষ দেখা যায়।

ভারতে প্রবেশকারী দলটি নিজেদের পরিচয় দিল 'আর্য' বা সভ্য এবং তারা এসে ভারতে যাদের দেখলো তাদের নাম দেয় অনার্য বা অসভ্য। ত্বকের বর্ণ, দেহের গঠন ও চেহারার আকৃতি অনুযায়ী বহিরাগত ও স্থানীয়রা দুটি শ্রেণীতে বা জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেল। স্থানীয়দের সাথে বহিরাগতদের লড়াই হলো কয়েক দফা। স্থানীয়রা বহিরাগতদের সাথে পেরে উঠলো না। তারা পর্যায়ক্রমে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে চলে গেল। অনেকে আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করে থেকে যায়।

আর্যদের মধ্যে প্রথমে শ্রেণী ভেদ ছিল না। কিন্তু কালক্রমে সামাজিক কর্ম বন্টনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী ভেদ অনিবার্য হয়ে উঠলো। শ্রেণী ভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হলো ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হলো বৈশ্য ও শূদ্র। এই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী এবং অনার্যদের মধ্যে যারা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করে থেকে যায়, সবাই বৃহত্তর অর্থে

www.pathagar.com

পামর শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ে। এদের সকলকে নিয়ে যে সমাজ, তা জনসাধারণের সমাজ, তারই নাম হলো পামর।

ভারতীয় জনসমাজকে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোন কোন ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানী ৮ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। কেউ কেউ করেন ৭ শ্রেণীতে। ১৯৩৩ সালে ডক্টর জে এইচ হার্টন ৮টি বিভিন্ন জাতিতে ভারতবাসীকে ভাগ করেন। কিন্তু ১৯৩৫, ১৯৩৭ এবং ১৯৪৪ সালে ডক্টর বিএস গুহ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে ভারতবাসীকে ৬ ভাগে ভাগ করেন। এর মধ্যে একটি শ্রেণীকে তিনি বলেছেন, প্রোটাঅস্ট্রালয়েড। তার মতে, এ জাতির লোক ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র (নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে) দেখতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর মানুষকে পামর, অচ্ছুৎ, হরিজন, অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হয়। আর্যদের জাতিভেদে শূদ্ররাই মূলত পামর। ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের সরাসরি পামর বলে থাকে। পামরদের কোন অধিকার ছিল না ধর্ম শাস্ত্র পাঠের, এমনকি শ্রবণেরও। ব্রাহ্মণ-আরোপিত ধর্মীয় এই নিষেধ অমান্য করার কারণে কতো পামরকে জীবন দিতে হয়েছে, তার কোন হিসাব নেই। আজও স্বাধীন ভারতে পামরদের ওপর কি জুলুম-নির্যাতন করা হয়, কতো নির্মমভাবে তাদের আগুনে দগ্ধ করা হয়, ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই এমন খবর ছাপা হয়।

ভারতে ইসলাম বিজয়ী বেশে প্রবেশের পর মুসলমানদের ম্লেচ্ছ, যবন, নেড়ে, পামর ইত্যাদি গালি দ্বারা বর্ণ হিন্দুরা চিহ্নিত করতো। এই উপমহাদেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত উগ্র বর্ণ হিন্দুরা তাদের লেখায় ও বক্তৃতায় মুসলমানদের এসব নামেই ডাকতো। এ নিয়ে অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়েছে। ব্যাল থ্যাকারদের কণ্ঠে এ সম্বোধন এখনও উচ্চারিত হয়। মুসলমানরা তাদের কাছে অস্পৃশ্য ছিল এবং এখনও এক শ্রেণী তা মনে করেন। মুসলমানের ছায়া তাদের উপর পড়লে সহ্য করতে পারে না। পানি ভর্তি মাটির কলসীর ওপর এ ছায়া পড়লে ভরা কলসী ভেঙ্গে ফেলা হয়। পিতলের কলসীর ওপর মুসলমানের ছায়া পড়লে তা 'গঙ্গা জলে' সাতবার

www.pathagar.com

ধৌত করে পবিত্র করতে হয়। এ কারণে তারা মুসলমানদেরও পামর বলে গণ্য করেন।

'আপামর' শব্দটি বর্ণ বৈষম্য, ধর্ম বৈষম্য এবং মানবিক আচরণের বিষময় বৈষম্যমূলক শব্দ। শুধু তাই নয়, এটি অমানবিক আর অনৈতিক বিদ্বেষ-বৈষম্যে ভরপুর। মুসলমানরা এমন একটি শব্দকে তাদের লেখায় ও বুলি-বচনে ব্যবহার করতে পারে না। 'জনসাধারণ' বললেই তো সর্বস্তরের লোককেই বুঝায়, 'পামর' শব্দ যোগ করার তো কোন মানে হয় না। হিন্দু শাস্ত্র মতে, পামরদের বাস হচ্ছে রৌরব নরকে।

মুসলমানরা কাউকে স্বর্গ-নরকের সার্টিফিকেট দেয় না বা দিতে পারে না। আশরাফ-আতরাফও নির্ণিত হয় পাপ-পূণ্যের দাঁড়িপাল্লায় ওজনের পর। 'সেই আশরাফ জীবন যার পূণ্য কর্মময়'। ক্রীতদাস হযরত বেলাল ইসলামের সীমানায় প্রবেশের পর মুসলমানরা তাকে ইজ্জত ও মর্যাদার যে উঁচু সিঁড়িতে আসীন করেছিলেন, মানব ইতিহাসে এমন দ্বিতীয় নজীর নেই। আজও মুসলমানরা বেলালের নাম উচ্চারণ করলে সাথে সাথে দুরূদ পড়েন। এক সময়ের ক্রীতদাস যে জাতির গুরুত্বপূর্ণ জেহাদে সিপাহসালারের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন, সেই জাতির কোন নরনারী কথায় বা লেখায় 'পামর' শব্দ দিয়ে জনসাধারণকে কি বোঝাতে পারে? ইসলামী সংস্কৃতি বিরোধী এই শব্দটি মুসলমানরা ঐতিহ্যগত কারণেও ব্যবহার করতে পারেন না।

আলিঙ্গন

এ হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ। আ+লিন্‌গ্‌+অন। মূল ধাতু লিন্‌গ্‌। আলিঙ্গনের বাংলা প্রতিশব্দ কোলাকুলি, বুকে জড়িয়ে ধরা, আশ্লেস। আলিঙ্গন মানে লিঙ্গ পর্যন্ত। কোলাকুলি বা জড়িয়ে ধরার সীমানা আলিঙ্গন শব্দের মধ্যেই নিহিত। সুতরাং কোলাকুলি আর আলিঙ্গন পরোক্ষভাবে দূরতম দিক দিয়ে একই অর্থবোধক হলেও এই দু'টি শব্দ একই ভাব প্রকাশ করে না। স্বাভাবিক

www.pathagar.com

আবেগে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকলে কোলাকুলি হয় পুরুষে পুরুষে বা নারীতে নারীতে, নারী-পুরুষে অবশ্যই নয়। আলিঙ্গন কিন্তু কোলাকুলির চৌহদ্দি মানে না। 'লিন্‌গ্' ধাতু দ্বারা গঠিত শব্দে লিঙ্গের প্রাধান্য রয়েছে এবং তা গোপনে নয়, প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা। আলিঙ্গন হচ্ছে বিশেষ অবস্থার জড়াজড়ি। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে কোলাকুলি করেন, কিন্তু জড়াজড়ি বা আলিঙ্গন করতে পারেন না। তাই আমাদের লেখালেখিতে বা কথাবার্তায় কোলাকুলি গ্রহণযোগ্য, আলিঙ্গন পরিত্যজ্য।

আবাহনী/আবাহন

মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা দেবতাকে আমন্ত্রণ হচ্ছে আবাহন। দেবতাকে আবাহন করার নিমিত্ত করপুট ও অঙুলীর দ্বারা কৃত স্তব বা গান। মুসলিম সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে কোন মুসলিম ক্রীড়াচক্রের বা দলের নাম তা হতে পারে না, যে দলে শতকরা ৯৮ জন রয়েছেন মুসলমান খেলোয়াড়।

উৎসর্গ

'উৎসর্গ' সংস্কৃত ভাষার একটি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ অর্পণ। এ অর্পণ স্বত্বত্যাগ করে অর্পণ। এ অর্পণ দেবতাকে অর্পণ। উৎসর্গ যখন জীবন দানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, তখনও এ উৎসর্গে দেবতার ছায়া থাকে, আমেজ থাকে। ধনদৌলত উৎসর্গের প্রেক্ষাপটও তাই। সংস্কৃত ভাষায় এমন কতিপয় শব্দ আছে, যেগুলো শুধু ধর্মীয় কারণে ব্যবহার হয়, উৎসর্গ তন্মধ্যে একটি। হিন্দু ধর্মে আছে, মানুষের অন্তরে নারায়ণের আসন। এ জন্য তাদের শাস্ত্রীয় পণ্ডিতের অভিমত হচ্ছে এই, নারায়ণ-প্রেম অন্তরে নিয়ে কোন মানুষকে কিছু দান করলেও তা 'উৎসর্গ' হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই শাস্ত্রীয় বিধান সীমাবদ্ধ থাকার কথা।

অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ইসলামী সংস্কৃতি-সচেতন ব্যক্তিত্ব হিন্দুদের শাস্ত্রীয় নারায়ণ-দর্শনের বেখেয়াল ও অসচেতন অনুসরণ করতে

www.pathagar.com

গিয়ে নিজেদের লেখা বই তাদের স্ব স্ব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বা স্নেহভাজন স্বজনকে 'উৎসর্গ' করে থাকেন। খুব ভালো কথা, সে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখাতে পারেন, কিন্তু 'উৎসর্গ' শব্দ ব্যবহার করে কেন তা করা হয়? এ শব্দ ব্যবহারে সবই যে বরবাদ হয়ে যায়। দেবতার জন্য যে শব্দটি নির্ধারিত, তাতে মুসলমানরা কেন হাত বাড়ান? দেবতাপন্থীরা তো মুসলমানদের থেকে কিছু নেয় না, মুসলমানদের শব্দ ভাণ্ডার থেকে তারা পারতপক্ষে কোন শব্দ আহরণ করে না।

মুসলমানরা হিন্দু ধর্মের শব্দ ভান্ডার থেকে উৎসর্গের মতো শব্দ গ্রহণ ও ব্যবহার করেন কেন, তা বুঝলাম না। মুসলমানদের শব্দ ভান্ডারে শব্দের কি এতই আকাল চলছে যে, 'উৎসর্গ' শব্দের কোন বিকল্প বা প্রতিশব্দ নেই? যদি না থাকে তাহলে ভিন্ন কথা আর যদি থাকে তাহলে কেন ভিক্ষুকের মত তা হাত বাড়িয়ে অপর থেকে গ্রহণ করেন?

বাংলাদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ইসলামের অর্থনীতির ওপর এক পুস্তক লেখে 'উৎসর্গ' করেছেন নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। স্বীকার করি, অধ্যাপক সাহেবের নবী-প্রেম অত্যন্ত প্রগাঢ়। নতুন রেওয়াজের প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু আবেগ তার এতো বেশি যে, দেবতার জন্য যে শব্দ অন্য ধর্মাবলম্বীরা ব্যবহার করে থাকেন, তিনি সেই শব্দ ব্যবহার করেছেন নবী মোস্তফা (সাঃ)-এর বেলায়। এ ক্ষেত্রে তিনি স্বকীয় সংস্কৃতির বিধি বিধান লংঘন করেছেন। আবেগের খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো না?

বই লিখে রসুল (সাঃ)-এর নামে 'উৎসর্গের' মানেটা কি? রসুল (সাঃ) কি দুনিয়ার প্রথাগত সম্মান ও শ্রদ্ধার মুখাপেক্ষী? সমাজের আর দশজনের মতো তাকে সম্মান প্রদর্শন কি সঠিক হলো? অন্য কেউ হয়তো এই অধ্যাপকের অনুসরণ করতে গিয়ে তার বই আল্লাহর নামে প্রথাগত ধারায় 'উৎসর্গ'ও করতে পারেন। যদি এই সিলসিলা চালু হয়ে যায়, তাহলে অবস্থাটা আখেরে কি দাঁড়াবে? এ আবেগ যদিও নেক আবেগ, কিন্তু তা

www.pathagar.com

প্রকাশের একটা চৌহদ্দি তো থাকবে, একটা বিধি থাকবে। কিন্তু এই অধ্যাপকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, শুধু আবেগ আর তার নেক নিয়ত, কিন্তু চৌহদ্দি বা আবেগ প্রকাশের বিধি-মান্যতাকে দেখা যাচ্ছে না। এই অধ্যাপক সাহেব বড় অক্ষরে 'উৎসর্গ' লিখে এর নিচে লিখেছেন, 'মানবতার মুক্তিদূত মহানবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)কে'। তিনি এ স্থানে লেখতে পারতেন 'যারা নবী (সাঃ)-এর নির্দেশিত অর্থ ব্যবস্থা বিশ্বে প্রবর্তনের জন্য নিরন্তর সংগ্রামে রত, এই পুস্তকখানা তাদেরই স্মরণে নিবেদিত, অথবা অনুরূপ কিছু লেখতে পারতেন।

প্রথম কথা হলো, তিনি অর্থাৎ এই অধ্যাপক সাহেব 'উৎসর্গ'-এর যে ধারা চালু করেছেন, তা ইসলামী ঈমান-আক্বিদা সমর্থিত কিনা? দ্বিতীয় কথা হলো, দেবতার জন্য 'উৎসর্গ' শব্দের যে ব্যবহার তা নবী মোস্তফা (সাঃ)-এর বেলায় ব্যবহার করা যায় কিনা। ইসলামসহ বিশ্বের প্রধান কয়েকটি ধর্মের নিজস্ব পরিভাষা আছে। হিন্দু ধর্মেরও নিজস্ব পরিভাষা আছে, উৎসর্গ তন্মধ্যে একটি। যেমন ইসলামের অযু, শুধু মুসলমানদের পবিত্রতার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, অন্য ধর্মাবলম্বীরা এই 'অযু' ব্যবহারের কোন সুযোগ বা ব্যবস্থাই নেই। সুতরাং 'উৎসর্গ' প্রসঙ্গে তাই বলা যায়, দেবতার জন্য যে শব্দ, তা নবী মোস্তফার ক্ষেত্রে কি ব্যবহার করা যায়?

তৃতীয় কথা হলো, 'উৎসর্গ' শব্দটি তিনি রসুল (সাঃ)-এর শানে ব্যবহার করে কি বেয়াদবী করেননি?

শেষ কথা হলো, 'উৎসর্গ' পৃষ্ঠায় নবী মোস্তফা (সাঃ)-এর ওপর দুরুদ ও সালাম পেশ করলে কি সবচেয়ে ভালো হতো না? অধ্যাপক সাহেব অবশ্য জানেন, দেবতাকে যা 'উৎসর্গ' করা হয়, তা ফিরিয়ে নেয়ার বিধান নেই এবং ফিরিয়ে নেয়াও হয় না। রসুল (সাঃ) দেবতা নন, তিনি রসুল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। এই সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে তিনি যা 'উৎসর্গ' করলেন, তা তিনি বাজারজাতও করেছেন, বই বিক্রয়লব্ধ অর্থও নিচ্ছেন, বইখানা ফি সাবিলিল্লাহ বিতরণ করছেন না। অতএব বলা যায়, তার 'উৎসর্গ' শব্দের স্বত্ব

www.pathagar.com

ত্যাগের অর্থে ও লক্ষ্যে প্রয়োগও হয়নি। তাহলে তিনি কি করলেন? দেবতার ফুল হাতে নিয়ে তিনি নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে প্রকারান্তরে নবীকে কি অসম্মান করলেন না? সত্যকে আবেগের ঊর্ধে উঠে বোঝার তওফিক আল্লাহ তাকে দিন, তার জন্য আমার এই মোনাজাত।

'উৎসর্গ' শব্দের পরিবর্তে আমাদের শব্দ-ভান্ডারে অনেক শব্দ আছে। আমরা 'নজরানা' শব্দ ব্যবহার করতে পারি। নজরানা আরবী শব্দ। এর ইংরেজি তরজমা হচ্ছে A Present to a superiors। আমরা ব্যবহার করতে পারি তোহফা ও হাদিয়া শব্দ।

মুসলমানদের জন্য 'উৎসর্গ' শব্দটি অপসংস্কৃতিমূলক শব্দ। সাধারণ অর্থে এর ব্যবহার শুধু আপত্তিকর নয়, কবীরা গুনাহও বটে। নজরানা, তোহফা, হাদীয়া এসব শব্দ ব্যবহার যদি ভালো না লাগে, এসব শব্দে যদি মৌলবাদী গন্ধ পাওয়া যায়, তাহলে 'উৎসর্গ' পৃষ্ঠায় আমরা লেখতে পারি, 'শ্রদ্ধা বা স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ...', 'অমুকের দস্ত মুবারকে' বা 'অমুকের স্মৃতির স্মরণে' ইত্যাদি। যার বেলা যেটা প্রযোজ্য তা আমরা ব্যবহার করতে পারি। 'উৎসর্গ' শব্দটি শুধু ঈমান-আক্বিদা বিরোধীই নয়, এ শব্দকে স্বীকার করে নেয়া মানে সেই শব্দ-সংস্কৃতির জাত-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। কলিকাতার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি উপন্যাসে দেখলাম, 'স্মরণে' শব্দ ব্যবহার, উৎসর্গ ব্যবহার করেননি তিনি।

ত্যাগের ক্ষেত্রে যখন 'উৎসর্গ' শব্দ ব্যবহারের আবেগ আসবে, তখন আমরা কুরবান বা কুরবানী শব্দ ব্যবহার করতে পারি। জীবন উৎসর্গ করা আর জীবন কুরবান করা মোটেই এক অর্থবোধক নয়। দেবতার উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করা মানে 'বলি' হওয়া আর আল্লাহর রাহে জীবন কুরবান করা মানে শহীদ হওয়া। মৃত্যু তো উভয় ক্ষেত্রে অবধারিত, কিন্তু স্টেটাসে আসমান-জমিন ফারাক। 'উৎসর্গ' শব্দ ব্যবহারে এখন থেকে আমরা যেন সতর্ক হই।

www.pathagar.com

উপাস্য

ব্যাকরণ বিধি অনুযায়ী উপাসনা বিশেষ্য, বিশেষণ হচ্ছে উপাস্য। উপাস্য অর্থ হচ্ছে যার উপাসনা করা যায়। যিনি উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। আরাধনা, পূজা, অর্চনা, ভগবৎচিন্তা ইত্যাদি হচ্ছে উপাসনা, যার উদ্দেশ্যে তা করা হয়, তিনি উপাস্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমানরা আল্লাহর উপাসনা করেন, না তার এবাদত বা বন্দেগী করেন? জ্বীন ও মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর এবাদত। এ কথা কালামে পাকে আল্লাহই ঘোষণা করেছেন। সুতরাং আল্লাহর বিধান যারা মানে, আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ মানে, তারা আল্লাহর গোলাম বা আব্দ হয়ে তার বন্দেগী করে, কিন্তু তার উপাসনা করে না। এ উপাসনা তো ভগবান, ঈশ্বর ও দেবতার ক্ষেত্রে। তারা উপাসনাকারীদের উপাস্য। মুসলমানরা করে আল্লাহর ইবাদত, কোন নবী-রসূলেরও নয়। এ এবাদতের ব্যাপ্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। এ এবাদতের নিয়ম কি? নিয়ম একটাই। আল্লাহ যেভাবে এবাদত করতে বলেছেন এবং প্রাকটিক্যাল আমলের সর্বোত্তম ও সুন্দরতম মডেল তার হাবীবের জীবনাচরিত ও জীবনাচরণ এবং কর্মের মাধ্যমে দুনিয়ার সামনে রেখেছেন, এরই অনুশীলন, অনুসরণ ও অনুকরণের নাম এবাদত। এবাদত আবশ্যিক, কিন্তু উপাসনা ঐচ্ছিক। এবাদত না করলে বান্দাহর দায়িত্ব আদায় হয় না, উপাসনা না করলে দায়িত্বের প্রশ্ন উঠে না।

এ জন্য উপাসনা আর এবাদতে আসমান-জমিন ফারাক। সুরা কাফেরুনে পরিস্কারভাবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন, 'বলে দাও, হে কাফেররা, আমি এবাদত করি না তোমরা যার এবাদত কর। তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর। তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন।

এই সুরার বাক্যগুলোতে একই শব্দ প্রায় প্রত্যেক বাক্যে এসেছে। সেই

www.pathagar.com

শব্দটি হচ্ছে 'এবাদত'। এই শব্দটি আল্লাহ পাক তার রসুল (সাঃ)-এর মাধ্যমে উচ্চারণ করিয়েছেন এবাদত অর্থে, অথচ কাফেরদের বেলায় তা হয়েছে উপাসনা অর্থে। এবাদত যদি উভয় ক্ষেত্রে একই অর্থবোধক হতো, তাহলে মাবুদও এক হতেন, দ্বীন নিয়ে কোন ফ্যাসাদ হতো না।

এই সুরাই পরিস্কার করে দিচ্ছে, মুসলমানরা আল্লাহকে পূজা করে না, তার আরাধনা করে না, তার উপসনা করে না, বরং করে তার বন্দেগি, তার এবাদত এবং তার এতেয়াত। তাই এবাদত যার করা যায়, তার উপাসনা করা যায় না। আবার উপাসনা যার করা যায়, তার এবাদত করা যায় না। উপাসনা আর উপাস্য আমাদের ব্যবহার উপযোগী শব্দ নয়। আমাদের শব্দ ভান্ডারে রয়েছে এবাদত, মাবুদ ইত্যাদি কতো শব্দ। ইসলামের পরিভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যাদের তরজমাও হয় না।

অযুর তরজমা কি হবে? অযুর ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু তরজমা করা যায় না। বাংলা ভাষায় এমন কোনো শব্দ নেই, যা দিয়ে এক বা দু'শব্দে তা প্রকাশ করা সম্ভব। সিয়ামকে রোজা দিয়ে ভাষান্তরও করা যায়, কিন্তু উপবাসে সেই অর্থ প্রকাশ পায় না।

একেশ্বরবাদ

একেশ্বরবাদ মানে এক ঈশ্বরবাদ। অদ্বিতীয় ঈশ্বর মতবাদ। বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে একেশ্বরবাদ-এর অর্থ করা হয়েছে এভাবে, 'আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এই দার্শনিক মত, অদ্বৈতবাদ'। একেশ্বরবাদী অর্থ করা হয়েছে 'আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এই মতে বিশ্বাসী'।

বাংলা একাডেমী কোন্ যুক্তি এবং প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে ঈশ্বর আর আল্লাহকে এক মনে করলেন এবং একই অর্থবোধক বলে চালিয়ে দিলেন, তা বুঝলাম না। কর্তৃপক্ষীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেও ব্যাখ্যা পাইনি।

বাংলা একাডেমীই শুধু এই ভুল করেননি, বাংলা ভাষাভাষী অনেক মুসলিম লেখকও একই ভুল করে আসছেন। অনেকে তওহীদ শব্দটি না

www.pathagar.com

লেখে 'একেশ্বরবাদ' লেখে থাকেন। কেউ কেউ লেখেন অর্থের দিকে খেয়াল না করে আর কেউ কেউ লেখেন অন্যদের অন্ধ অনুসরণ করে। যিনি বা যারা যে কোন কারণেই তওহীদের পরিবর্তে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করুন না কেন, তারা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক বা বেখেয়ালের কারণেই হোক, আল্লাহকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরকে যে গ্রহণ করেছেন, তাকি ভেবে দেখেছেন? তওহীদ শুধু আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে নয়। ঈশ্বরের ঈশ্বরী আছে, ঐশী আছে, ভগবানের আছে ভগবতী। হিন্দু শাস্ত্র মতে, প্রত্যেক দেবদেবী উপাস্য, গোটা সৃষ্টিতে রয়েছে তাদের ভাগাভাগি দায়-দায়িত্ব। কিন্তু আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। গোটা সৃষ্টির একক স্রষ্টা তিনি। সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে বা কোন ক্ষেত্রে অংশীদারীত্বের ভাগাভাগি নেই আল্লাহর। তার কোন স্ত্রী নেই, নেই কোনো আওলাদ, তিনিও কারো আওলাদ নন। সুতরাং অদ্বিতীয় বা ওয়াহিদ, আহাদ বা তওহীদ শব্দ শুধু লা শরীক আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য কারো ক্ষেত্রেও নয়। যে সব মুসলিম লেখক একেশ্বরবাদী বলতে এক আল্লাহতে বিশ্বাসীদের বুঝে থাকেন বা বুঝিয়ে থাকেন, তাদের এই বুঝটার সূত্র, উৎস কি, তা জানতে পারলে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতাম, তাদের অবস্থান কাহাতক শক্ত ভিত-নির্ভর।

মুসলমানরা তওহীদপন্থী, তওহীদের অনুসারী, এক আল্লাহতে বিশ্বাসী। আল্লামা ইকবাল বলেছেন, তওহীদ কি আমানত সিনোওমে হ্যায় হামারে, মমকিন নাহি হ্যায় মিটানা নামও নিশান হ্যামারে। এবার চিন্তা করে দেখুন, যে সীনাতে তওহীদের আমানত সেই সীনাতে তো আল্লাহরই স্থান, ঈশ্বরের স্থান নয়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে কিভাবে কলবে রাখি?

যে ভুল আমরা করে আসছি, সে ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে, সে দিকে তওহীদপন্থীদের খেয়াল থাকা উচিত।

www.pathagar.com

এলাহিকাণ্ড

এলাহিকাণ্ড মানে বিরাট ব্যাপার, মহা আড়ম্বর বা অকল্পনীয় বিরাট কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা। ইংরেজিতে Grand Pompous শব্দ দ্বারা এলাহিকান্ড বুঝানো হয়। শব্দটি যথাস্থানে সঠিক। লেখায় সঠিক অর্থে প্রয়োগ হলে কোন প্রশ্ন সৃষ্টি হয় না। আলাপচারিতায় উচ্চারিত হলেও ভাল। 'এলাহিকাণ্ড' মানে যা সাধারণত ঘটে না এমন কাণ্ড। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ ঘটনার পিছনে এলাহি নেই? তার কুদরতী হাত তো রয়েছে সর্বত্র, প্রত্যেক আয়োজনে, প্রত্যেক কর্মকাণ্ডে এবং প্রত্যেক ব্যাপারে। যদি আমরা তা স্বীকার করি, তাহলে তো এলাহির শোকরিয়া আদায় করা উচিত।

এলাহিকাণ্ড বিরাট ও শুভ অনুষ্ঠানের বর্ণনা ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োগ হতে পারে, তেমনি অপরদিকে বিরাট দুর্ঘটনা, মহাদুর্যোগ, মহাবিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও বর্ণনার প্রয়োজনে আসতে পারে। কিন্তু কথা হলো, যিনি এ শব্দের প্রয়োগ করবেন, এলাহিতে তার ঈমান কি গভীর না হালকা, না ঈমানই নেই, তার প্রয়োগ-বুদ্ধি ও বিবেচনা বোধ কেমন, তাও দেখতে হবে। অথবা তিনি কি শুধু কৌতুক বা উপহাস করার জন্য শব্দটি প্রয়োগ করছেন কিনা, এ সব দিক বিবেচনা করে এ অভিমত ব্যক্ত করতে পারি যে, তিনি শব্দটির সঠিক অর্থে সঠিক ব্যবহার করছেন কিনা। ধরুন, ভিন ধর্মের এক উগ্র সাম্প্রদায়িক লেখক বা সাংবাদিক, যিনি সুযোগ পেলেই মুসলিম পরিভাষা, মুসলিম কৃষ্টি সংস্কৃতিমূলক শব্দ ব্যবহার করেন ব্যঙ্গ বা তীর্যক মন্তব্য করার জন্য। তিনি যখন 'এলাহিকাণ্ড' দিয়ে কোন বাক্য রচনা করবেন, তখন এ শব্দের ব্যবহারে সুবিচার করবেন না। 'মুসলমান' শব্দকে 'মুচলমান' বানানে না লিখলে তিনি মনে শান্তি পাবেন না। একজন মুসলিম লেখক দুনিয়াকে বলেছেন, 'কুদরতের কারখানা', এক অমুসলিম লেখক বলেছেন, 'দুনিয়া এক অগ্নিকুণ্ড'। এভাবে যার ঈমান যে দৃষ্টিকোণ থেকে দুনিয়াকে গ্রহণ করেছে, তিনি সেভাবে দুনিয়াকে চিত্রিত করেছেন বা করে থাকেন।

'এলাহিকাণ্ড' প্রয়োগে আমাদের ঈমানী সচেতনতা থাকা উচিত।

www.pathagar.com

ঐশীবাণী/ঐশী শক্তি

এই দুটি শব্দ তো বাংলা ভাষাভাষী অধিকাংশ মুসলিম লেখক এমনকি বড় বড় মওলানা ও ইসলামী চিন্তাবিদ সাধারণ শব্দের মতো ব্যবহার করছেন। তাদের লেখায় ও বক্তৃতায় শব্দ দু'টি আসছে। আজকাল অনেক মুসলিম পরিবারে মেয়ের নাম ঐশী রাখছেন। ঐশী নামের মুসলিম মেয়ে সমাজে অনেক, কিন্তু আয়েশা বা ফাতেমা নামে কোনো হিন্দু মেয়ে এই দুনিয়াতে একটিও নেই। ঈশ্বর শব্দ থেকেই ঐশীর উদ্ভব। ঐশী (ঐশী শক্তি) বিণ (স্ত্রী)। হিন্দু শাস্ত্র মতে, ঈশ্বর থেকে আগতবাণীকে ঐশীবাণী বলে এবং ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিকে বলে ঐশী শক্তি।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অনেক মুসলমান লেখক ওহিকে ঐশী বাণী বলে থাকেন ও লিখেও থাকেন। কোন কোন বুজর্গ ব্যক্তির বুজুর্গীকেও অনেকে 'ঐশী শক্তি' বলে থাকেন। যেমন অমুক পীর সাহেব বা অমুক হুজুর ঐশী শক্তি প্রাপ্ত। যারা ঐশী শব্দের এমন ব্যবহার করে থাকেন, তারা যদি না বুঝে করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন, কিন্তু বুঝে যদি ব্যবহার করেন, তাহলে তারা শিরকের মতো কবিরা গুণাহ করছেন। তারা কি জানেন না যে, ইসলামে ঈশ্বর, ঈশ্বরী, ঐশ, ঐশিক, ঐশ্বর, ঐশ্বরিক, ঐশীর কোনো স্থান নেই। যদি তাই হয়, তাহলে ওহিকে ঐশীবাণী আর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিকে 'ঐশী শক্তি' মুসলমানরা কিভাবে বলতে পারেন?

এই শিরক পাপ থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন এবং কোন্ শব্দ আমাদের সংস্কৃতি ও ঈমানের পরিপন্থী, তা বুঝবার এবং গ্রহণ-বর্জনের আমল করার তওফিক দিন।

কীর্তন

গুণ বর্ণনা ও যশঃ প্রচার অর্থে 'কীর্তন' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন অনেক মুসলিম লেখক। কিন্তু তারা জানেন কিনা যে, কীর্তন শব্দটির উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ধর্মীয়। রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গানই হলো কীর্তন। রাধা

www.pathagar.com

কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কীর্তন যারা করে, তাদের বলে কীর্তক। কীর্তন গানের সুর হচ্ছে কীর্তনাঙ্গ। মুসলমানদের মধ্যে যারা আলাপ-আলোচনায়, লেখায় 'কীর্তন' শব্দ ব্যবহার করেন, তারা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কতটুকু যোগ্য ব্যবহার করেন, তা ভেবে দেখার অনুরোধ রাখছি। প্রশংসা, সুখ্যাতি, তারিফ ইত্যাদি শব্দ যখন 'কীর্তন'-এর বিকল্প শব্দ আমাদের ভান্ডারে আছে, তখন রাধা কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক 'কীর্তন'কে নিয়ে মুসলমানরা কেন টানাটানি করেন? অন্য ধর্মের সাংস্কৃতিক শব্দ ব্যবহার আইনগত দিক দিয়ে যেমন অনধিকার হস্তক্ষেপ, অপরদিকে তা হয়ে যাচ্ছে অপসংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং আমল ও অনুশীলন।

'কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন' এ কথা আমরা কৌতুকে, উপহাসে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বলে থাকি এবং লেখেও থাকি। এমন ব্যবহারে হয়তো গভীরতা ততো নেই, তাই এড়িয়ে চলা যায়, কিন্তু ভারী কথায় যেন এ শব্দের ব্যবহার কখনো করা না হয়, সে দিকে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত অবশ্যই।

জয়ন্তী

জয়ন্তী অর্থ পতাকা, ইন্দ্রকন্যা, দুর্গা; শ্রী কৃষ্ণের জন্ম তিথি বা জন্ম রাত্রি। শ্রী কৃষ্ণের জন্ম হয় ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় অষ্টমীর রাতে। হিন্দুরাই শ্রী কৃষ্ণের জন্ম স্মরণে জন্মাষ্টমীতে জন্মাষ্টমী পূজা করেন এই তারিখে। এরই জের ধরে চালু হয় জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান। হিন্দু সম্প্রদায় জন্মাষ্টমীর অনুসরণে তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ম দিন স্মরণে উৎসব অনুষ্ঠান করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উৎস হচ্ছে শ্রী কৃষ্ণের জন্ম তিথি থেকে। এই ধারাবাহিকতার 'ঐতিহ্য' রক্ষা করে আমরাও রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নজরুল জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান করে থাকি। ইন্দ্রকন্যা, দুর্গা ও শ্রী কৃষ্ণের জন্মের স্মৃতিবাহী জন্ম জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান তো হিন্দু শাস্ত্র দ্বারাই প্রমাণিত। আধুনিক অভিধানে 'জয়ন্তী' সংস্কৃতিকে বাংলা ভাষাভাষী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য জন্মদিনের উৎসব (Birth day celebration) বা

www.pathagar.com

জুবিলী অর্থও করা হয়েছে। দুর্গা ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মের স্মরণে জয়ন্তী অনুষ্ঠান মুসলমানরা ঈমান-আক্বিদাগত কারণে পালন করতে পারেন না। মনে রাখা দরকার, জন্মদিন আর জয়ন্তীকে জোর করে একই অর্থবোধক শব্দ হিসেবে হাজির করলেও এ দুইয়ের সাংস্কৃতিক ব্যবধানে আসমান-জমিন ফারাক। এ কারণে মুসলমানরা কখনো জয়ন্তী শব্দও ব্যবহার করা উচিত নয়।

'জয়ন্তী'র আর এক নাম দেয়া হয়েছে জুবিলী। শব্দ সংস্কৃতি নিয়ে কি যে এক চক্রান্ত চলছে, তা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা জয়ন্তীর আগে রৌপ্য, স্বর্ণ, হীরকযুক্ত করে নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন। যেমন রৌপ্য জয়ন্তী বা রজতজয়ন্তী, সুবর্ণ বা স্বর্ণজয়ন্তী এবং হীরক জয়ন্তী। ইংরেজিতে নামগুলো যথাক্রমে Silver jubilee, Golden jubilee এবং Diamond jubilee। জয়ন্তী আর জুবিলী অর্থ জন্মানুষ্ঠান করা হলেও প্রকৃতপক্ষে জুবলী অর্থ ভিন্ন। জন্মদিনের সাথে কোন মিল নেই। যদিও দূরতম অর্থে মিল ঘটানো হয়েছে।

jubilee শব্দের উদ্ভব ঘটেছে যেভাবে, আগে সে দিকে আমাদের নজর দেয়া উচিত। ফরাসী ভাষায় jubile, ল্যাটিন ভাষায় jubiaeus এবং হিব্রু ভাষায় yobel-এই তিনের অর্থ যা, ইংরেজি jubilee অর্থও তাই। প্রামাণ্য ইংরেজি অভিধানে জুবেলী অর্থ করা হয়েছে The blast of a trumpet. Blast অর্থ প্রবল বাত্যা, ঝঞ্ঝা, বিস্ফোরণ আর Trumpet অর্থ ভেঁপু, ভেরীধ্বনি ইত্যাদি। আভিধানিক অর্থকে সামনে রেখে জুবিলী অর্থ হয় মহোৎসব, মহাআনন্দ উৎসব ইত্যাদি।

রজত, সুবর্ণ ও হীরক জয়ন্তীর ইতিহাস যতটুকু জানা যায়, তা হচ্ছে এই-

সিলভার জুবিলী : রোমান ক্যাথলিক গীর্জাগুলোর প্রতি পঁচিশ বছর পর জাঁকজমকের সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উৎসব পালন করে থাকে। এ উৎসবের নাম তারা করেছে সিলভার জুবিলী (Roman catholic church celebration of a twenty fifth anniversary).

www.pathagar.com

গোল্ডেন জুবিলী : পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে ইহুদিগণ কর্তৃক পালনীয় উৎসব বিশেষ। এ সময়ে তারা ক্রীতদাসদের এবং ঋণদাতাদের মুক্ত করে পূণ্য লাভ করে। দীন-দুঃখীদেরও দান করে। (The jewish celebration of a fitieth anniversary)। ইহুদীরা এই অনুষ্ঠানকে মনে করে পাপ মুক্তির অনুষ্ঠান, অন্যদিকে তারা আনন্দ অনুষ্ঠানও মনে করে।

ডায়মন্ড জুবিলী : ষাট বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে আনন্দানুষ্ঠান। প্রথমে এক শ্রেণীর খ্রীস্টান (সম্ভবত প্রোটেস্টান্ট) যাদের বয়স ষাট বছর পূর্ণ হতো, তারা হীরক জয়ন্তী পালন করতো। পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানের বয়স ষাট বছর হলে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠান পালন করতে থাকে। এ প্রথা এখনও প্রচলিত।

লক্ষ্যণীয়, এই তিনটি জুবিলী অনুষ্ঠানের সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই। একটি রোমান ক্যাথলিকদের অনুষ্ঠান, অপরটি ইহুদীদের অনুষ্ঠান, তৃতীয়টিও খ্রীস্টান অনুষ্ঠান। তিনটিরই উদ্ভব ঘটেছে ধর্মীয় উৎস থেকে। মুসলমানদের মধ্যে যারা রজতজয়ন্তী, সুবর্ণ জয়ন্তী আর হীরক জয়ন্তী পালন করেন, তারা যদি বলেন যে, আমরা তো জুবিলী পালন করি না, জয়ন্তী পালন করি, তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে শুধু বলবো, জনাবরা, আপনারা কি জানেন যে, জয়ন্তীও আপনাদের নয়, জুবিলীও আপনাদের নয়। জয়ন্তীর সাথে দুর্গা ও শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক আর জুবিলীর সাথে খ্রীস্টান ইহুদিদের সম্পর্ক। আপনারা অপরের একান্ত ধর্মীয় শব্দ ও অনুষ্ঠান নিয়ে কেন টানটানি করেন? আপনারা জয়ন্তী জুবিলীতে না গিয়ে ২৫/৫০/৬০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান কি করতে পারেন না? নিজের ঐতিহ্য সংস্কৃতিভিত্তিক বহু শব্দ আছে, তা তালাশ করে কাজে লাগান।

জলাঞ্জলি

জলাঞ্জলি শব্দটি ব্যবহার করা হয় অপচয়, অপব্যয় ও সম্পূর্ণ বরবাদ হওয়ার অর্থে। এ শব্দের দু'টি রূপ আছে, একটি বাহিরের অন্যটি ভিতরের।

www.pathagar.com

বাহিরের রূপ বেশ সুন্দর, প্রয়োগও ভালো, কিন্তু ভিতরের রূপটা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ শব্দের ভাবগত সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাও আপত্তিকর। 'জলাঞ্জলি' হচ্ছে হিন্দুদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। শব্দটি সংস্কৃত ভাষার বৈদিক সংস্কৃতির একটি শব্দ। এর সন্ধি বিচ্ছেদ করলে এই দাঁড়ায় : জল+অঞ্জলি= জলাঞ্জলি।

শবদাহের পর হিন্দুরা প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে আঁজলাপূর্ণ পানি চিতায় ছিটিয়ে দেয়। এই ধর্মীয় কর্মের নাম 'জলাঞ্জলি', অন্য নাম 'বিসর্জন'। জলাঞ্জলির মতো আরও অনুষ্ঠান রয়েছে হিন্দু ধর্মে। যেমন ঘৃতাঞ্জলি (ঘৃত+অঞ্জ লি), পুষ্পাঞ্জলি (পুষ্প+অঞ্জলি), শ্রদ্ধাঞ্জলি (শ্রদ্ধা+অঞ্জলি), কৃতা লি (কৃত+অঞ্জলি), তিলাঞ্জলি (তিল+অঞ্জলি) প্রভৃতি অনুষ্ঠান। এসব পারিভাষিক শব্দ হিন্দুদের পূজা মন্দির এবং দেবদেবীর পূজার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়।

দুঃখের বিষয়, অনেক মুসলমান এসব শব্দের ব্যবহারে ঈমান-আক্বিদাগত কোন বাধা আছে বলে মনেই করেন না। মৃতজনের লাশের পাশে বা কবরে অথবা স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য পুষ্পস্তবকের ওপর কাগজে লেখে দেয়া হয় 'শ্রদ্ধাঞ্জলি', এর নিচে পুষ্প অর্পণকারী ব্যক্তি, সংগঠন বা সংস্থার নাম দেয়া হয়। এই রেওয়াজ ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ, এ দ্বারা অন্য ধর্মের অনুকরণ ও অনুসরণ করা হয়।

মৃতজনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বা ভালোবাসা প্রদর্শনের সর্বোত্তম ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামে। সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে মৃতজনের কল্যাণও হয়। কিন্তু পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা মৃতজনের কোন কল্যাণ হয় না বরং তাতে আযাব বাড়িয়ে দেয়া হয়। শুধু ফুল বিক্রেতা ও ফুলের বাগানের মালিকের অর্থনৈতিক লাভ হয় এবং একটা বেদায়াতকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। যা হোক, এসব 'অঞ্জলি'র ব্যবহার দ্বারা অপর ধর্মের সংস্কৃতিরই আমরা পৃষ্ঠপোষকতা করছি আর নিজস্ব সংস্কৃতিকে করছি অবহেলা। সঠিক আত্মপোলব্ধি আমাদের মধ্যে জাগ্রত হোক।

www.pathagar.com

জীবন রক্ষাকারী ওষুধ

এই খণ্ড বাক্যের সঙ্গে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই পরিচিত। পত্রপত্রিকায় এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে ওষুধ কোম্পানির বিজ্ঞাপনে এই বাক্য দেখা যায়। ওষুধ কোম্পানির ওষুধ সরবরাহকারী গাড়ির বডিতেও বাক্যটি লেখা দেখা যায়। প্রত্যেক ওষুধই জরুরি এবং যে ওষুধ যে রোগের জন্য তৈরি করা হয়েছে, সে রোগের জন্য সে ওষুধ অত্যন্ত জরুরি। প্রশ্ন হচ্ছে, ওষুধ কি জীবন রক্ষাকারী? কখনো নয়। ওষুধ রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে মাত্র। ওষুধই যদি জীবন রক্ষাকারী হতো, তাহলে কোন জীবনেরই মৃত্যু হতো না। বিশেষ করে ধনীরা ওষুধ ব্যবহার করে অমরত্ব লাভ করতেন। উন্নত, মহৎ ও সুস্থ জীবন-যাপনের জন্য অনেক কিছুরই আমরা সাহায্য গ্রহণ করি, কিন্তু কোনো কিছুকেই আমরা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করি না। শুধু ওষুধকে কেন জীবন রক্ষাকারী বলি? ওষুধ ব্যবহার করে রোগী রোগমুক্ত হয়, আবার হয়ও না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিনা ওষুধেই রোগ-মুক্তি ঘটে। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের অভিমত, শতকরা ৭৫ ভাগ রোগের ক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহার করার দরকারই পড়ে না।

'জীবন রক্ষাকারী ওষুধ' যখন আমরা বলি, তখন জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে হোক আমরা শিরকের কাছাকাছি চলে যাই। নিরাময়কারী একমাত্র আল্লাহ। তিনিই রোগ মুক্ত করেন। তিনি রোগ দেন, ওষুধও তারই অবদান, সুস্থতা দান তারই দেয়া অশেষ নিয়ামত। আয়ু যতো দিন আছে, এ আয়ুর রক্ষাকারীও তিনি, ওষুধ নয়। আয়ু যখন শেষ হয়, তখন কোন ওষুধই কাজ করে না। মৃত্যুই তার ফয়সালা করে দেয়।

আমরা যেন আর 'জীবন রক্ষাকারী ওষুধ' না বলি। ওষুধ মানেই ওষুধ, যার জন্য যেটা প্রযোজ্য তার জন্য তা অত্যন্ত জরুরি। ওষুধ হচ্ছে দৈহিক অসুস্থতা দূরীকরণের সহায়ক মাত্র, এর অধিক কিছু নয়।

www.pathagar.com

তীর্থযাত্রী/তীর্থযাত্রা

১৯৮৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর সৌদি তথ্য মন্ত্রণালয়ের দাওয়াতে বাংলাদেশের ১৩ জন সাংবাদিক ১৬ দিনের সফরে সৌদি আরব যান। আমিও ছিলাম সফরকারী দলের অন্যতম সদস্য। রিয়াদ বিমানবন্দরে অবতরণের পর চেকিং ফরম্যালিটিজ শেষ হলে যখন আমরা বাহিরে আসি, তখন দেখি সৌদি তথ্য মন্ত্রণালয়ের দু'তিনজন কর্মকর্তা ছাড়াও বাংলাদেশ দূতাবাসের কয়েকজন কর্মকর্তা আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন। তাদের মধ্যে কে একজন আমাদেরই দলের এক প্রবীণ সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সফরের উদ্দেশ্য কি? ভদ্রলোকের ইনফরমেশন গ্যাপ ছিল। তিনি জানতেন না, আমাদের এ সফরের উদ্দেশ্য কি। যাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি উদ্দেশ্য-বিধেয় সবই ভালোভাবে বুঝিয়ে বললেন এবং এর সাথে বললেন, 'আমার নিয়্যাত কিন্তু অন্য, তীর্থযাত্রীর নিয়্যাত। এই পবিত্র নিয়্যাত নিয়ে এসেছি। ওমরা করতে পারলেই মনে করবো, আমার এ আগমন সফল'।

'তীর্থযাত্রী', 'তীর্থযাত্রা' এসব শব্দ এই প্রবীণ সাংবাদিকের কণ্ঠে উচ্চারণ শুনে অবাক হলাম। এ শব্দ তো মুসলমানের শব্দ নয়, মুসলিম সংস্কৃতি কৃষ্টির কোনো পরিভাষাও নয়, তাহলে কি তিনি না জেনে শব্দটি উচ্চারণ করলেন? তার ভুল শোধরিয়ে দেয়ার তাৎক্ষণিক ইচ্ছা জাগলো আমার। কিন্তু সফরের ক্লান্তি এবং আমার ছোট একটা ব্যাগ লাপাত্তা হওয়ার কারণে প্রতিবাদ করার বা ভুল শোধরিয়ে দেয়ার ইচ্ছাটা নিস্তেজ হয়ে পড়লো। কিছু বললাম না। ব্যাগটি অবশ্য পাঁচ দিন পর আমার হাতে পৌঁছে। রিয়াদ প্যালেস হোটেলে পৌঁছে বাদ এশা তার কাছে 'তীর্থ' সংক্রান্ত বিষয়টা উত্থাপন করলাম এবং আমি যতোদূর জানি, এ শব্দের সংজ্ঞা দিলাম এবং ব্যাখ্যা করলাম। আশ্চর্য হলাম, তিনি কোনো প্রতিবাদ করেননি, বিতর্কে অবতীর্ণ হননি। আমার কথা তিনি মেনে নিলেন এবং আশ্বাস দিলেন এ ভুল আর ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে হবে না। এ সুসংবাদ শুনে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

www.pathagar.com

প্রকৃত পক্ষেই এ সংস্কৃত শব্দ 'তীর্থ' মুসলিম পরিভাষায় নেই। 'তীর্থ' যে ভাষার শব্দ সে ভাষার অভিধানে 'তীর্থ' শব্দের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তার বাংলা করলে এই দাঁড়ায়, 'তীর্থ' মানে পূণ্য স্থান (মিলন তীর্থ), হিন্দু দেবতা বা মহাপুরুষদের লীলা ক্ষেত্র বা বাস ভূমি, পাপ মোচনের স্থান (A place for Pilgrimage)। তীর্থ অর্থ গুরু, পণ্ডিত ইত্যাদি। ব্যাকরণ তীর্থ ও কাব্য তীর্থ প্রভৃতি শব্দ গুরু বা পণ্ডিত অর্থযুক্ত।

Dr. Annandale's Concise English Dictionaryতে তীর্থ যাত্রীর সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে, ই ষটভঢণরণর; a Traveller; One that travels to a distance from his own country to visit a shrine or holy place or to Pay his devotion to the remains of dead saints.

ডঃ এন্‌নানডেল-এর সংজ্ঞা এবং সংস্কৃত অভিধানের সংজ্ঞা, এ দুয়ের কোন একটিও মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বাংলা একাডেমী 'তীর্থ'-এর অর্থ লিখতে গিয়ে তীর্থ শব্দকে খতনা করে মুসলমান করেছেন, কিন্তু কলেমা পড়াননি। বাংলা একাডেমী তীর্থ অর্থ লিখেছেন 'পাপ মোচন' আর ব্রাকেটে লিখেছেন (মক্কা তীর্থ)। নকল করতেও দক্ষতা লাগে, সে দক্ষতাও বাংলা একাডেমী দেখাতে পারেনি। মক্কায় মুসলমানরা তীর্থ করতে যান না, যান হজ বা ওমরা করতে। মুসলমানদের অভিধানে তীর্থ শব্দই নেই, কোন মুসলমান যদি মক্কা তীর্থ, মদীনা তীর্থ বা হৃদয় তীর্থ লেখেন, তাহলে এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা তীর্থ সংস্কৃতিকে যে বরণ করে নিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার মনে হয়, মক্কা, মদীনা ও হৃদয়কে তীর্থ অভিধায় অভিহিত করে অজ্ঞাতে একটা গুণাহর কাজ করা হয়। 'তীর্থের কাক'ও পরিত্যজ্য। তীর্থকেই যখন স্বীকার করি না, তখন তীর্থের কাক আর চিলকে তো গ্রহণ করতে পারি না।

যা হোক, 'তীর্থ' যাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের জন্য যথার্থ শব্দই 'তীর্থ', আমাদের জন্য নয়। মুসলমানদের তিনটি মসজিদ জিয়ারতের জন্য সফরের অনুমতি আছে। তিনটি মসজিদ হলো মসজিদে হারাম,

www.pathagar.com

মসজিদে নববী এবং মসজিদুল আকসা। কোন কবর জিয়ারতের জন্য সফরে বের হতেও শরীয়তে মানা আছে, তা যার মাযারই হোক।

তিলোত্তমা

ভালোবাসার পত্র মিতালীতে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে এমনকি রাজনৈতিক বক্তৃতায়ও তিলোত্তমা শব্দ ব্যবহার অনেকেই করেন। মুসলমানরাও বাদ নেই। ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গে ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র একাধিকবার 'তিলোত্তমা' শব্দটি উচ্চারণ করেছেন। তিনি (মোহাম্মদ হানিফ) ঢাকা মহানগরীকে তিলোত্তমার মতো গড়ার ওয়াদা করেছিলেন বার বার। বলা বাহুল্য, যারা তিলোত্তমা শব্দটি ব্যবহার করেন, তারা পরমা সুন্দরী অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেন। যারা এ শব্দের ব্যবহার করেন, তাদের অনেকেই হয়তো জানেন না যে, অপ্সরারই আর এক রূপ ও গুণ বিশিষ্ট হলো স্বর্গের তিলোত্তমা। হিন্দু শাস্ত্র মতে, অপ্সরার মতো তিলোত্তমাও স্বর্গের এক বেশ্যা। সুন্দ ও উপসুন্দের বধের জন্য ব্রহ্মার নির্দেশে (বিশ্বকর্মাকর্তৃক) তিল তিল করে সৃষ্টির যাবতীয় সৌন্দর্য আহরণ করে নির্মিতা অপ্সরা হলো তিলোত্তমা।

সুন্দ আর উপসুন্দ হচ্ছে দুই অসুর বা দানব। সুন্দ এবং উপসুন্দের লড়াইর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হচ্ছে এই, দানব ভ্রাতৃদ্বয় সুন্দ ও উপসুন্দের অদম্য প্রতাপে দেবকুল বিষম বিপাকে পড়লে ব্রহ্মা তিলোত্তমা সৃষ্টি করে ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে প্রেরণ করেন এবং তিলোত্তমাকে লাভার্থ তারা দু'জনে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে উভয়েই নিহত হন।

মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, বেহেশতে কোনো বেশ্যা নেই, অপ্সরা বা তিলোত্তমা নামেরও কেউ নেই। বেশ্যা যতো সুন্দরী হোক না কেন, তাকে কোন পবিত্র মনের মানুষ সুন্দরের মডেল বানাতে পারেন না। অতএব কোন মুসলমান কখনো তিলোত্তমা শব্দটি লেখায় ও বক্তৃতায় সুন্দরের উপমায় আনতে পারেন না। কোন মহানগরীকে তিলোত্তমার মতো গড়া মানে সুন্দরী

www.pathagar.com

বেশ্যার মতো গড়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা। মুসলমানদের অবশ্যই এ শব্দ থেকে দূরে থাকা ঈমানের দাবি। কোন বেশ্যার রূপ-সৌন্দর্য অপূর্ব থাকলেও সে অপবিত্র, নাপাক, কলঙ্কে কলঙ্কিত। চরিত্রে সে পবিত্র নয়।

তুলসী পাতা/ধোয়া তুলসী পাতা

তুলসী পাতার রস কফ-কাশিতে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়। ইউনানী ও কবিরাজী শাস্ত্র মতে তুলসী পাতার ওষধী গুণ বহুমুখী। তুলসী গাছকে হিন্দুরা পবিত্র জ্ঞান করেন। অনেক হিন্দু পরিবারের ঘরের কোণায় বা উঠানের মধ্যস্থলে তুলসী গাছ দেখা যায়। হিন্দুরা যে মাটির ওপর তুলসী গাছ রোপণ করে নিত্য পূজা করেন, এই মাটির ঢিপিকে তুলসী বেদী বলা হয়। হিন্দুদের মতে, তুলসী গাছ অতি পবিত্র, বিভিন্ন পূজার জন্য এর ব্যবহার অপরিহার্য। তুলসী গাছের পাতাও পূজার উপকরণ হিসেবে অত্যাবশ্যকীয়। নারায়ণের প্রসন্নতা লাভের জন্য তার চরণে ধোয়া তুলসী পাতা দেয়া হয়। একে তো তুলসী পাতা পবিত্র, উপরোন্তু ধোয়া তুলসী পাতা আরো পবিত্র। হিন্দু লেখকদের মাধ্যমে 'ধোয়া তুলসী পাতা' সাহিত্যে ও মুখের ভাষায়ও এসেছে। অনেক মুসলিম লেখক কোন ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই 'ধোয়া তুলসী পাতা'র ইতিহাস না জেনেই ব্যবহার করেন। মুসলমানরা এ শব্দ ব্যবহারে বিরত থাকা উচিত। ধোয়া তুলসী পাতা অমলিন কলঙ্কবিহীন চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু আশ্চর্য, এই 'ধোয়া তুলসী পাতা' বাক্যাংশটি লেখায় বা আলাপচারিতায় পজিটিভ অর্থে খুবই কম ব্যবহার হয়। যখনই ব্যবহারে আসে তখনই একটি প্রশ্নবোধক বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন যোগ হয়। যেমন, আরে ভাই রাখেন তো তার কথা, তিনি কি ধোয়া তুলসী পাতা? অথবা প্রার্থী-সমর্থকদের প্রচারের ভাষা শোনে মনে হয় যে, তাদের প্রার্থীর চরিত্র যেন ধোয়া তুলসী পাতা তুল্য! তবে পজিটিভ বা নেগেটিভ বা সন্দেহ-সংশয়সূচক যে অর্থেই তা ব্যবহার করা হোক না কেন, তুলসী পাতা যে পবিত্র এবং তা ধোয়া হলে আরো পবিত্র থাকে, এর স্বীকৃতি কিন্তু প্রতি

www.pathagar.com

বাক্যে থাকছে। মুসলমানরা কখনো তুলসী পাতাকে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না। তুলসী পাতা-সংস্কৃতি মুসলমানের জন্য নয়, এটাই শেষ কথা। উপমায় এর ব্যবহার শিরক তুল্য অপরাধ।

তুঘলকি কাণ্ড

সাধারণ চিন্তা বহির্ভূত কোনো পরিবর্তন বা অপ্রয়োজনে বিরাট অংকের অর্থ ব্যয়ের কোন কর্মকাণ্ড দেখলেই আমরা বলি 'তুঘলকি কাণ্ড'। ইতিহাসে এই অতি মেধাবী শাসক, যার চিন্তাধারা ছিল তার যুগের অগ্রগামী, তার নাম যুক্ত করে কেন আমরা তাকে এ অপবাদ দেই? অপবাদ দেয়ার দু'টি প্রধান কারণ থাকতে পারে বলে আমি মনে করি। এর একটি হলো তুঘলক সম্পর্কে আমাদের পড়াশোনা খুবই কম। অন্য কারণ হলো, তুঘলককে আমরা চিনেছি বা জেনেছি যাদের লেখা ইতিহাস পাঠ করে, তারা তুঘলককে কখনো ভালো চোখে দেখতেন না। যেমন তারা বাদশাহ আলমগীরকে কখনো ভালো বলেননি। হ্যাঁ, ব্যতিক্রম ইতিহাসবেত্তা আছেন, কিন্তু আমরা পাঠ করেছি তাদের ইতিহাস, যারা তুঘলককে পাগল বলতেন আর আলমগীরকে বলতেন সাম্প্রদায়িক।

বিশেষ করে মোহাম্মদ বিন তুঘলককে তারা পক্ষপাতিত্বের কারণে মারাত্মকভাবে বিদ্ধ করেছেন। কেউ কেউ তাকে বলেছেন কল্পনা বিলাসী, কেউ কেউ বলেছেন অবাস্তববাদী, পাগল, খামখেয়ালী (Don Quixote), উচ্চভিলাষী ইত্যাদি। তাদের পক্ষপাতিত্ব এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, যা প্রমাণ করে তারাই অন্ধ ও পাগল ছিলেন। এসব অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে মাত্র দু'জন ঐতিহাসিক পাওয়া যায়, যারা মোহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে তারই প্রশাসনের অধীনে চাকরি করেছেন, রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন, তন্মধ্যে একজন হলেন পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিক ইবনে বতুতা এবং অন্যজন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী। এই দু'জনই মোহাম্মদ বিন তুঘলককে যথাসাধ্য জঘন্যভাবে চিত্রিত করেছেন। পরবর্তী সময়ে যারা

www.pathagar.com

ইতিহাস লিখেছেন, তারা এই দু'জনের লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে ইতিহাস লিখেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, পরবর্তী সব ইতিহাসবিদই ছিলেন হিন্দু এবং ইংরেজ। একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঈশ্বরী প্রসাদ। হিন্দু এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক কেন বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া মোহাম্মদ বিন তুঘলককে গালি-গালাজ করে তার এবং তার শাসনামলের ইতিহাস লিখেছেন? তারা কেন এ চিন্তা করে দেখেননি যে, ওরা তো মোহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রচুর নিমক খেয়েছেন। এতদসত্ত্বেও কেন তারা নিমকদাতার বিরুদ্ধাচরণ করলেন, তার বিরুদ্ধে লিখলেন?

প্রথমে ইবনে বতুতার কথা উল্লেখ করা যাক। গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের (১৩২০-২৫) পর মোহাম্মদ বিন তুঘলক (উলুখ খান) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর এই শাসনকালেই অর্থাৎ ১৩৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে আসেন। আফ্রিকার বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে বতুতা তাঞ্জিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন ১৩০৪ সালে। ২১ বছর বয়সে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে বিশ্ব পরিভ্রমণে বের হন। ৮ বছর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে ভারতে আসেন। মোহাম্মদ বিন তুঘলক উঁচুস্তরের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হওয়ার কারণে ইবনে বতুতাকে এক নজর দেখেই বুঝতে পারেন যে, এই লোকটির মধ্যে রয়েছে গুণের অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার। তাই ইবনে বতুতাকে প্রধান কাজীর পদ প্রদান করেন। তিনিও সানন্দে এই পদ গ্রহণ করেন। ৮ বছর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর তিনি এক ঘটনায় ৮ বছর চাকরির পর সম্রাটের অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত হন। শুধু বঞ্চিতই হননি, বন্দিও হন। এ জন্য ইবনে বতুতাই দায়ী, তা তিনি এক পর্যায়ে স্বীকারও করেন এবং অব্যাহতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মোহাম্মদ বিন তুঘলক তাকে মুক্তি দেন এবং আবার তাকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেন। বন্দিদশা থেকে মুক্তির কিছু দিন পর ইবনে বতুতাকে চীন দেশে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। চীন থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি আসেন প্রথমে চট্টগ্রামে, পরে সিলেটে। সিলেটে এসে তিনি হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৩৪৯ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজ

www.pathagar.com

দেশেই ১৩৭৮ সালে মতান্তরে ১৩৭৭ সালে ৭৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

কাজীর চাকরি সসম্মানে এবং পূর্ণ সুযোগ-সুবিধাসহ ৮ বছর করার পর হঠাৎ একদিন মোহাম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে এবং পরবর্তী সময়ে বন্দি হন। বন্দি হওয়ার কারণে তিনি বাদশাহর ওপর এতই ক্ষুব্ধ হন যে, এরপর আর তিনি মোহাম্মদ বিন তুঘলকের মধ্যে কোন ভাল গুণ দেখতে পাননি। এমনকি বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর এবং চীনে দূত হিসাবে গমনের সৌভাগ্য অর্জন করার পরও বাদশাহর প্রতি তার ক্ষুব্ধ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেনি। এ জন্য প্রথম ৮ বছরের লিখিত বিবরণ এবং পরবর্তী সময়ে লিখিত বিবরণের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি অনেক ভুল তথ্যও লিপিবদ্ধ করেন। আত্মস্বার্থে আঘাতই তার এ বিরোধিতার প্রধান কারণ, তা অনেক ঐতিহাসিক এ মত ব্যক্ত করেছেন। প্রথম ৮ বছরের বিবরণ ও পরবর্তী বিবরণের ওপর যারা গবেষণা করেছেন, তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন, তারা ইবনে বতুতার এই ত্রুটি ধরেছেন, এর ওপর ইতিহাস লিখেছেন। মোহাম্মদ বন তুঘলকের চরিত্র আট বছর পর্যন্ত দেখলেন চমৎকার, সুন্দর, তার মধ্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা পেলেন সুগভীর ও ভারসাম্যপূর্ণ কিন্তু কাজীর চাকরি যাওয়ার পরই তিনি দেখলেন বিপরীত চরিত্রের তুঘলককে। এ ইবনে বতুতার বিদ্বেষমূলক মনোভঙ্গির পরিচায়ক নয় কি?

এবার আলোচনা করা যাক জিয়াউদ্দিন বারানীর ওপর। বারানীর বাসস্থান ছিল দোয়াব অঞ্চলের বারানে। খোরাসান ও কারচিলের সমরাভিযানে, প্রতীক মুদ্রার বিপুলতায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং প্রচুর অর্থ অপব্যয় হলে মোহাম্মদ বিন তুঘলক দোয়াব অঞ্চলের কর বৃদ্ধি করেন। কর বৃদ্ধির কারণ ছিল বিদ্রোহী হিন্দু ভূস্বামীদের দমন করা।

ঐতিহাসিক বাদায়ুনী বলেন, সামরিক বাহিনী এবং প্রশাসনিক কাঠামোকে সুসংহত ও পুনর্গঠনের জন্য কর বৃদ্ধি করতে সুলতান বাধ্য হন। জিয়াউদ্দিন বারানী যেহেতু এই এলাকার মানুষ ছিলেন, তাই তার ওপরও

www.pathagar.com

বর্ধিত কর আরোপিত হয়। আর এ কারণে ব্যক্তি স্বার্থে আঘাত লাগার ফলে সুলতানের রাজস্বনীতির তীব্র সমালোচনা শুরু করেন। ঐতিহাসিক বারানীর সব রকমের সমালোচনা ব্যক্তিগত আঘাতের প্রতিঘাত ছাড়া আর কিছু নয়। সুলতানের প্রতি জিয়াউদ্দিন বারানীর বিক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ এটাই। সুতরাং বলা যায়, পরবর্তী সময়ে যারা ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের প্রায় প্রত্যেকে ইবনে বতুতা এবং জিয়াউদ্দিন বারানীর বিবরণকে নকল বা অনুসরণ করেছেন।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর সেক্যুলার ভাবাপন্ন মন-মানসিকতার মুসলমান ইংরেজ এবং হিন্দু ঐতিহাসিকদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে মুহাম্মদ বিন তুঘলককে পাগল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং 'তুঘলক' মানেই করেছেন একটা পাগল রাজার নাম, পাগলের নাম, খামখেয়ালী শাসকের নাম। বাস্তবতা বর্জিত যে কোন কর্মকাণ্ডকে তারা তুঘলকি কাণ্ড বলে থাকেন। এসব অভিধায় তাকে অভিহিত করার একমাত্র কারণ হচ্ছে, বিদ্বেষপরায়ণ মানুষের লেখা ইতিহাস পাঠ এবং তুঘলক সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানার আগ্রহের অভাব আর নিজেদের পূর্ব পুরুষকে গালি দেয়ার একটা বদঅভ্যাস।

মোহাম্মদ বিন তুঘলককে খামখেয়ালী কল্পনা বিলাসী রাজা বলা হয় যে সব কারণে, তন্মধ্যে একটি ছিল দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরীতে রাজধানী স্থাপন। রাজধানী পরিবর্তনের এই পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা যাদের আঁতে তখন ঘা লাগে, তারাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এটা কোন অবাস্তব পরিকল্পনা ছিল না। তৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল বর্তমানের তুলনায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। বিশাল সম্রাজ্যের রাজধানী এমন এক জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া উচিত, যেখান থেকে সহজে সাম্রাজ্যের যে কোন স্থানে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। দেবগিরী (নতুন নাম দৌলতবাদ) থেকে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের দূরত্ব ছিল সাতশ মাইলের মধ্যে। তিনি দৌলতবাদে রাজধানী স্থানান্তরকরণ সিদ্ধান্তের সাথে সাথে দিল্লি থেকে

www.pathagar.com

সাতশ' মাইল দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করেন। পথিমধ্যে পথিকের খাদ্য বাসস্থানের ও নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করেন। যাহোক, তার এই রাজধানী স্থানান্তর নতুন কোন প্রচেষ্টা বা নতুন পরিকল্পনাও ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বহু শাসকই নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন এবং প্রতিষ্ঠাও করেছেন। বর্তমানের আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বহু দেশে রাজধানী তিন চার বার পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়েছে। মোহাম্মদ বিন তুঘলক প্রায় সাড়ে ৬শ' বছর আগে যা চিন্তা করতেন, আমরা ৬শ'/সাড়ে ৬শ' বছর পর চিন্তা করছি, চিন্তার বাস্তবায়ন করছি। এ জন্য ঐতিহাসিকগণ তাকে বলেছেন, মোহাম্মদ বিন তুঘলক চিন্তা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের দিক থেকে তার যুগ অপেক্ষা অগ্রবর্তী ছিলেন।

প্রাচীন তাম্র মুদ্রার জন্যও মোহাম্মদ বিন তুঘলককে খেয়ালী ও অবাস্তববাদী বলা হয়। মিঃ থমাস তাকে তংকা নির্মাতাদের রাজা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার প্রবর্তিত মুদ্রা নতুনত্ব এবং গঠন বৈচিত্রের দিক দিয়ে ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং কার্যকারিতার দিক দিয়ে এই মুদ্রার শিল্প সম্মত পরিপূর্ণতা ছিল প্রশংসনীয়। আসল মুদ্রার ও জাল মুদ্রার পার্থক্য করার মতো কোন ব্যবস্থা ছিল না তাম্র মুদ্রায়। ফলে 'প্রত্যেক হিন্দু গৃহ মুদ্রা তৈরির টাকশালে পরিণত হয়'। বলা যায়, সুলতানের সরলতাই চক্রান্তকারীদের কাছে মার খায়। তার তাম্র মুদ্রার প্রচলন কখনো পাগলামি বা খেয়ালিপনা ছিল না।

ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন, মুসলিম বিজয়ের সময় থেকে যেসব সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, তাদের মধ্যে সর্বাধিক বিদ্বান ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন মোহাম্মদ বিন তুঘলক। অন্য এক ঐতিহাসিকের মন্তব্য হচ্ছে এই, মোহাম্মদ বিন তুঘলক তৎকালীন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং দুর্লভ কতিপয় গুণের অধিকারী শাসক বিধাতা বোধহয় একজনই সৃষ্টি করেছিলেন, যার নাম মোহাম্মদ বিন তুঘলক। দিল্লীর সিংহাসনে তো দূরের কথা, কোন দেশের ক্ষমতার আসনে সর্বশাস্ত্রে

www.pathagar.com

এমন একজন পণ্ডিত অধিষ্ঠিত হননি। প্লেটো বা এরিস্টোটলের মতো পণ্ডিত বেঁচে থাকলে মোহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিস্ময়াভিভূত হতেন। তিনি ছিলেন সৃষ্টির এক অবিসংবাদিত বিস্ময়। গার্ডনার ব্রাউন, ডক্টর ঈশ্বরী প্রসাদ, আগা মেহেদী হোসেন এ মত সমর্থন করেছেন।

ইবনে বতুতা এবং জিয়াউদ্দিন বারানী তুঘলকের কট্টর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি উদার কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তর্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত ও শরীর বিজ্ঞানে মোহাম্মদ বিন তুঘলক শুধু ভালো জ্ঞান রাখতেন তাই নয়, তিনি এসব প্রত্যেক বিষয়ের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয়ের ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও ছিলেন ঈর্ষণীয় প্রতিভার অধিকারী। প্রায়ই তিনি রোগীদের ব্যবস্থাপত্র দিতেন। তিনি ছিলেন হাফেজে কুরআন। সেকালের শ্রেষ্ঠ লিপিকারের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। লেখক হিসাবে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার সময়ের কোন লেখক কোন বিষয়ের ওপর তাকে চ্যালেঞ্জ করে প্রতিযোগিতামূলক লেখার সাহস করতেন না। তিনি ছিলেন সে কালের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও বাগ্মী। ইবনে বতুতা যদিও মোহাম্মদ বিন তুঘলককে শেষ পর্যায়ের বিবরণে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু তিনি একথাও লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, তিনি (মোহাম্মদ বিন তুঘলক) নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় বিধান পালন করতেন, ইবাদত বন্দেগী করতেন, নিয়মিত জামায়াতে নামাজ পড়তেন, নফল ইবাদতও করতেন। বেনামাজী মুসলমানকে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নম্র। নিরপেক্ষ বিচারে তিনি ছিলেন অনন্য বিচারক। বংশীয় কৌলিন্য ও পদ কোন দোষীকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারতো না। কাজীর আদেশে তিনি আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে মোটেই ইতস্তত করেননি। সকল মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক বিচার প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি হিন্দুদের ঘৃণ্য সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এ জন্য কুলীন হিন্দুরা তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। অকাতরে তিনি গরীব-দুঃখীকে দান করতে ভালোবাসতেন।

www.pathagar.com

ইবনে বতুতা এবং জিয়াউদ্দিন বারানীও তাকে পাগল বলেননি। মোট কথা, এতো বড় একজন গুণী ব্যক্তির পরিকল্পনা, চিন্তাধারা ও শাসন প্রণালী যুগের অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে যদি তা পাগলামি হয়, তাহলে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক ও প্রতিভাবানই পাগল। যারা মোহাম্মদ বিন তুঘলককে পাগল বলেছেন, তারা প্রকৃত পক্ষে তার প্রতিভাকে, জ্ঞানকে, দূরদর্শিতাকে বুঝতে পারেননি। মোহাম্মদ বিন তুঘলকের কপাল কিন্তু শাসক তুঘলককে সমর্থন করেনি। তাঁর মুত্তাকী চরিত্র অবশ্যই সম্প্রদায় বিশেষের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিল। এ জন্য তাকে নিয়ে পরবর্তীতে যে ইতিহাস রচিত হয়েছিল, তা হয়েছে পক্ষপাতদুষ্ট। আমরা তাকে না বুঝেই বলি পাগল। আর তার তুঘলক উপাধিটাকেই জোর করে বানিয়েছি পাগলের সমার্থক।

দুশমনদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে যদি পাগলামি কাণ্ডকে তুঘলকি কাণ্ড বলি, তাহলে কি নিজেদের গায়ে নিজেরাই কুড়াল মারছি না? আসুন, আমরা নিজেদের অতীতকে দুশমনের দেয়া চশমা ছাড়া নিজেদের ঈমান ও বিবেকের চশমা দিয়ে দেখি এবং সত্যকে আবিষ্কার করে গর্ববোধ করি।

দৈববাণী

'দৈব' শব্দকে সাধারণত অদৃষ্ট বা ভাগ্য অর্থে ব্যবহার করা হলেও শব্দটি দেব সম্পর্কিত। দৈব দুর্ঘটনা মানে যে ঘটনার পিছনে থাকে দেবতার হাত। দেবতা যখন ঘটনার নায়ক হন, তখন তা দৈব ঘটনাই হয়ে থাকে। 'দুর্বিপাক'-এর অর্থও অনুরূপ। যে দুর্ঘটনার জন্য মানুষ দায়ী নয়, দেবতা সৃষ্ট দুর্ঘটনা, তাই দুর্বিপাক। 'দৈববাণী' আসে অদৃশ্য থেকে, অদৃশ্য থেকে দেবতা যে বাণী শুনিয়ে থাকেন বা শোনা যায়, তাই দৈববাণী। দৈবাদেশ হচ্ছে দেবতার আদেশ। দিব্যি, দিব্য, দৈবাৎ, দৈবক্রমে, দুর্দৈব সবই দেবতা সম্বন্ধীয়, দেবতা থেকে সৃষ্ট। মুসলিম সমাজে এসব শব্দ বেশ প্রচলিত। পবিত্র কোরআন শরীফের এক তফসীরে দেখেছি এই বাক্যটি 'হযরত মোহাম্মদ (সঃ) হেরা গিরী গুহায় দৈববাণী শুনলেন, পড় তোমার স্রষ্টার

www.pathagar.com

নামে...।' কুফরী ও শিরকী এই শব্দ মুসলিম সমাজে প্রায়ই লেখায় বা কথাবার্তায় ব্যবহার হচ্ছে। যারা দেবতা সম্পর্কীয় শব্দ ব্যবহার করেন, তারা শব্দগুলোর বুৎপত্তিগত অর্থের কোন খবরই রাখেন না। মুসলমানদের কোন দেবতা নেই, আছেন লা-শরীক এক আল্লাহ। 'তার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্য কণাও অংকুরিত হয় না'। এ হচ্ছে কোরআনের শিক্ষা। যদি তাতে আমাদের ঈমান থাকে, তাহলে দেবতাকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? রাব্বুল আলামীনের কুদরতী শক্তির নিয়ন্ত্রণের বাহিরে আসমান-জমিনে ও পাতালে কিছুই নেই। তাই আর কখনো দৈববাণী নয়, নয় ঐশীবাণী। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

প্রজন্ম

রাজ শেখর বসুর অভিধান চলন্তিকায় (১৩৪০ বাংলা সনে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত) প্রজন্ম শব্দই নেই। আশুতোষ দেবের অভিধানের প্রথম কয়েক সংস্করণে এ শব্দ ছিল না। 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান'-এর প্রথম মুদ্রণে এবং পরবর্তী দু'টি মুদ্রণেও শব্দটি পাইনি। চতুর্থ সংস্করণে এর প্রথম সংযোজন ঘটে। বাংলা একাডেমীর অভিধান দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯২, ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে এই শব্দটি ছিল না। কলিকাতার 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' পরবর্তী সংস্করণে এ শব্দটি সংযোজিত হয় এবং কলিকাতার বাবুরা লেখালেখিতে এ শব্দের ব্যবহার শুরু করেন, তখন বাংলাদেশের কলিকাতাপন্থী লেখক, সাংবাদিকরা 'ভবিষ্যৎ বংশধর' অর্থে 'প্রজন্ম' শব্দের ব্যবহার শুরু করেন। বর্তমানে এর অবাধ ব্যবহার চলছে বাংলাদেশে বাংলা রাজ্যের (পশ্চিম বাংলা) বাবুদের মতো। ইসলামপন্থী লেখক, সাংবাদিক এবং ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবীরাও এ শব্দ ব্যবহারে মোটেই পিছিয়ে নেই বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাবুদের চেয়েও বেশি অগ্রসর।

সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে 'প্রজন্ম' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'সমকালীন ব্যক্তিবৃন্দ' Generation, পুরুষ পরম্পরায় বিশেষ এক স্তর। এ শব্দটি

www.pathagar.com

'প্রজন' (গবাদি পশুর গর্ভ সঞ্চারকরণ, Breeding) এবং প্রজনন (সন্তানোৎপাদন, প্রসব, জন্মদান) শব্দ থেকে উদ্ভুত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রজন্মের অর্থ যদি 'সমকালীন ব্যক্তিবৃন্দ'ই হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যৎ বংশধর বা নতুন বংশধর অর্থ করি কোন্ প্রামাণ্য যুক্তির বলে? বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে 'প্রজনন' শব্দের অর্থ এভাবে দেয়া হয়েছে, '১ বি, সন্তান সৃষ্টি বা উৎপাদন বা প্রসব। ২ বি, জন্মদান'। লক্ষণীয়, 'জনন' মানেই জন্ম। প্রজনন, প্রজাত, প্রজন্ম সবই এক অর্থবোধক এবং উৎসও একই। এখন যদি বিশেষ প্রজাতির পণ্ডিতেরা গরু-ছাগল-ভেড়া-ঘোড়ার 'জননকে' বা জন্মকে মানুষের বংশধরদের জন্মের ক্ষেত্রে চালিয়ে দেন আর তা আমাদের গ্রহণ করতে হয়, তাহলে পশু আর মানুষের বংশধরদের মধ্যে তফাৎ থাকলো কি? এখন চিন্তা-ভাবনা করে আমাদের দেখা উচিত, 'প্রজন্ম' ব্যবহার ভদ্রজনোচিত ও শালীন কিনা। এ সম্পর্কে আলোচনা করলে দীর্ঘ আলোচনা করা যায়, কিন্তু ভিন্ন একটি জাত বা সম্প্রদায়ের মাইথোলজি টান দিতে হয়। যা হোক, অন্তত রুচি ও শালীনতার জন্য বাংলা ভাষী মুসলমানরা 'প্রজন্ম' ব্যবহার করা উচিত নয়। জেনারেশন-এর বাংলা অনুবাদ হবে বংশধর, প্রজন্ম নয়। প্রজন্মের পরিবর্তে 'বংশধর' লিখতে বা বলতে কেন মহল বিশেষ নারাজ, তা আমি বুঝতে পারি না। আবহমানকাল থেকে লেখালেখি ও কথাবার্তায় এই শব্দটিই ব্যবহার হয়ে আসছে। 'বংশধর' শব্দের মধ্যে অগ্রহণীয় এমন কি আছে? 'প্রজন্ম', 'প্রজনন' আর 'প্রজন' সহোদর তুল্য। কারণ, উৎস এক ও অভিন্ন। মানব বংশকে সেই উৎসের পরিচয়ে পরিচিত করা কোন অবস্থাতেই শোভন নয়। যদি তা করা হয় তাহলে তা হবে মানব জাতির অবমাননা। আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা হানিকরও বটে। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে যারা প্রজন্মকে 'বংশধর'-এর পরিবর্তে ব্যবহার করে পরম তৃপ্তিবোধ করেন, তারা মেহেরবানী করে আমার এ ব্যাখ্যাটি আবার পাঠ করে দেখতে অনুরোধ করি। অতএব 'নতুন প্রজন্ম' বা 'আগামী অথবা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম' ব্যবহার আর নয়, আসুন আমরা লিখতে শুরু করি 'নতুন বংশধর/নতুন খান্দান' বা আগামী

www.pathagar.com

অথবা ভবিষ্যৎ বংশধর/খান্দান। মনে রাখতে হবে, আশরাফুল মাখলুকাতের জন্মধারা পশুর জন্ম ধারার মতো নয়। তাই পশুর ক্ষেত্রে যে শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তা মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। শব্দ প্রয়োগেও মর্যাদার তারতম্য থাকা উচিত।

প্রয়াত

শব্দটি ব্যাকরণে বিশেষ্য। এর অর্থ হলো প্রস্থান, গমন। বিশেষণে প্রয়াত। এর অর্থ হলো 'চলে গিয়েছে বা পরলোকগত হয়েছে এমন'। প্রয়াত আর প্রয়াণ একই অর্থবোধক। প্রয়াণ সংস্কৃত শব্দ, প্রয়াতও তাই। উভয় শব্দের অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। প্রাণী মাত্রই মরণশীল। জন্ম আর মৃত্যু দুনিয়ার জীবনের শুরু ও শেষ অবস্থার নাম। এ ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় দিকটি হচ্ছে এই, প্রয়াত আর প্রয়াণ অর্থ মৃত্যু হলেও কোনো পশু-পাখির মৃত্যু বুঝাতে গেলে আমরা প্রয়াত বা প্রয়াণ শব্দ ব্যবহার করি না। আমরা বলি, পশুটির মৃত্যু হয়েছে বা পাখিটি মারা গিয়েছে। প্রয়াত বা প্রয়াণ শব্দ দু'টি যে ধর্মের বা সংস্কৃতির শব্দ, সেই ধর্মের ধর্মাবলম্বী বা সেই সংস্কৃতির অনুসারীরা তাদের মৃতদের নামের আগে প্রয়াত বা প্রয়াণ সঙ্গত কারণেই ব্যবহার করতে পারেন। কারণ, মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণের সাথে তার জন্য দোয়ার বাক্যও উচ্চারণের কোন রেওয়াজ বা ব্যবস্থা নেই সে ধর্মে। কিন্তু মুসলমানদের তথা ইসলামে সে ব্যবস্থা আছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এ উচ্চারণ মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক। যেমন ধরুন আমরা যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিকের নাম উচ্চারণ করি, সাথে সাথে অর্থাৎ কোন বিরতি না দিয়ে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' উচ্চারণ করি এবং এ উচ্চারণের মাধ্যমে তার জন্য দোয়া করি। কারো নামের পরে 'রাহমাতুল্লাহ'ও বলি। সম্মানিত মুসলমানদের নামের পূর্বে বা পরে যোগ করার জন্য কয়েকটি শব্দই রয়েছে যা গভীর অর্থবোধক এবং পবিত্র লক্ষ্যভিত্তিক। এ জন্য অন্য ধর্মের সংস্কৃতির অভিধান থেকে মুসলমানদের শব্দ হাওলাত করার কোন প্রয়োজন নেই। মুসলমানদের জন্য

www.pathagar.com

রয়েছে দু'টি মূল্যবান ও গভীর অর্থবোধক শব্দ। দুনিয়ার যে কোনো ভাষাভাষী মুসলমান শব্দ দু'টি নিজস্ব শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেন। এই দু'টি শব্দের একটি হলো 'মরহুম' আর অন্যটি হলো 'ইন্তেকাল'। দু'টি শব্দই আরবী ভাষার শব্দ, যা ইসলামী পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত।

'মরহুম' শব্দটি ব্যাকরণ বিধি অনুযায়ী বিশেষণ। মরহুম শব্দের অর্থ হলো যিনি আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হন (A Recipient of Allah's mercy)। ইন্তেকাল অর্থ মৃত্যু হলেও মুসলমানদের মৃত্যু একান্তভাবে ইন্তেকাল। ইন্তেকালের অর্থ হলো Removal, Transfer ইত্যাদি। অর্থাৎ আসল ঠিকানায় যাত্রা বা প্রত্যাবর্তন। এ জন্য এক মুসলমানের ইন্তেকালের সংবাদ অন্য মুসলমানের কাছে পৌঁছার সাথে সাথে অন্যান্য জিজ্ঞাসার আগে পড়তে হয় ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এর অর্থ হচ্ছে 'বস্তুত আমরা আল্লাহর, তার দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন'। মানুষকে আল্লাহ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন তার খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে। প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণের উদ্দেশ্য মাত্র একটি আর তা হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাহ হিসাবে আল্লাহর এবাদত। এই এবাদত করার জন্যও আল্লাহ নির্দিষ্ট একটা জীবন দিয়েছেন। এই জীবন শেষ হলে আল্লাহ তার বান্দাহকে তার কাছে নিয়ে যান। বান্দাহ তার প্রভুর প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়াতে এসে কি কি দায়িত্ব কিভাবে পালন করলো, সে হিসাব তিনি নেন। যেখান থেকে বান্দাহর আগমন, সেখানে প্রত্যাবর্তন, দুনিয়ার ঠিকানা অস্থায়ী, ইন্তেকালের পরের ঠিকানা স্থায়ী। কোন বান্দাহ জানেন না তিনি কতো দিন প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়াতে থাকতে পারবেন। এ জন্য সচেতন বান্দাহ সদা সতর্ক ও সচেতন থাকেন, কখন তার ডাক আসে আসল ঠিকানায় প্রত্যাবর্তনের। এরই নাম ইন্তেকাল। প্রয়াত বা প্রয়াণ মুসলমানদের ব্যবহার উপযোগী শব্দ নয়। 'ইন্তেকাল' শব্দের কোনো বিকল্প শব্দ নেই।

যে সব মুসলমান প্রয়াত প্রয়াণ শব্দ ব্যবহার করে ইন্তেকালকে আউট করতে চাচ্ছেন, তারা আত্মঘাতী মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছেন। যদি তারা

www.pathagar.com

অজ্ঞতাবশত অথবা বেখেয়ালে প্রয়াত শব্দ ব্যবহার করেন, তাহলে তাদের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি, তাদের মধ্যে আল্লাহ পাক যেন শুভবুদ্ধি জাগ্রত করেন, কোন্‌টা নিজের আর কোন্‌টা অপরের, এই বাছ-বিচার করার বুদ্ধি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের দেন।

যে সব মুসলমান জেনে বুঝে মরহুম আর ইন্তেকালের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমেছেন, তারা নিশ্চিত জেনে রাখুন, তাদের মৃত্যু প্রয়াত আর প্রয়াণের অন্তর্ভুক্ত হবেই। তারা কখনো মরহুম হবেন না, ইন্তেকালের ফায়দাও পাবেন না। তাদের মৃত্যু সংবাদ শুনে কেউ ইন্নালিল্লাহ পড়বে না। অতীতেও মুসিলম নামের অনেকের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মৃত্যু সংবাদ শুনে কেউ ইন্নালিল্লাহ পর্যন্ত পড়েননি।

নিজেদের সংস্কৃতি কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের শব্দ ভাণ্ডারে মরহুম আর ইন্তেকালের মতো অফুরন্ত মর্যাদা ও বরকতময় শব্দ থাকতে কেন যে তারা অপরের দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করে শব্দ আনেন আর নিজেদের ভিত্তিকে প্রকারান্তরে দুর্বল করেন, তা আমার বুঝে আসে না। অর্থ ভিক্ষা যে চায়, সেই শুধু ভিক্ষুক নয়, অপরের সভ্যতা-সংস্কৃতি আর কৃষ্টি যারা ভিক্ষা করে তারাও ভিক্ষুক বরং এমন ভিক্ষুক আসল ভিক্ষুকের চেয়ে অধিকতর নির্লজ্জ ও ব্যক্তিত্বহীন।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, লেখক ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী মরহুম আতাউর রহমান খান ইন্তেকালের কিছু দিন আগে এক সুধী সমাবেশে অত্যন্ত আবেগময় কণ্ঠে প্রসঙ্গত বলেছিলেন, 'আমি ইন্তেকাল করার পর আমাকে কেউ প্রয়াত করবেন না, প্রয়াণে পাঠাবেন না। আমি ইন্তেকালের পর প্রয়াত হতে চাই না, মরহুম থাকতে চাই। আমার ইন্তেকালের পর কেউ আমার নামের আগে প্রয়াত যুক্ত করবেন না'।

মরহুম খানের এই দোয়াই হোক আমাদের সকলের দোয়া।

www.pathagar.com

বেদী

যজ্ঞ বা পূজাদির জন্য প্রস্তুত পরিস্কৃত উচ্চ স্থান (যজ্ঞের বা দেবতার বেদী), বেদীকে পীঠও বলা হয়। পূজা মণ্ডপের যে স্থানে দেবতার পূজা করা হয় তা পূজার বেদী। এই বেদী শব্দটি একমাত্র পূজার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বেদীর প্রতিশব্দ মঞ্চ, ডায়াস ইত্যাদি করা হলেও তা মানায় না বরং বেদীর মর্যাদা নষ্ট করা হয়। কারণ, বেদীর সম্পর্ক শুধু পূজার সাথে আর তার স্থান পূজামণ্ডপ। মঞ্চ বা ডায়াস পূজার সাথে সম্পর্কহীন।

২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজকদের মধ্যে যারা ছিলেন অনুষ্ঠানের ঘোষক বা উপস্থাপক, তারা শত বার 'শহীদ মিনারের বেদী' উচ্চারণ করেছেন। যেমন অমুক অমুক বা অমুক দল বা সংগঠন শহীদ মিনারের বেদীতে ফুল অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলেন। এ বাক্যটি বিভিন্ন বর্ণনায় ঘোষণা করলেও 'শহীদ মিনারের বেদীতে' এই বাক্যাংশটি বরাবরই অপরিবর্তিত থাকে। যে নকশাকে শহীদ মিনার বলা হয়ে থাকে, তা মিনারের নকশার ধারে কাছেও নয়। মিনারের নকশা কি, তা যে কোনো সাধারণ মানুষও চেনেন। যা হোক, তবুও যে নকশাকে মিনার বলা হচ্ছে এবং এ মিনার যাদের উদ্দেশ্যে নির্মিত তাদের কেউই হিন্দু ছিলেন না, প্রত্যেকে ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সম্মানসূচক যে কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে 'বেদী' আসতে পারে কেমন করে? বেদীতো পূজা মণ্ডপেই থাকে। শহীদ মিনার অর্থাৎ 'শহীদ' ও 'মিনার' মুসলমানদের একক ঐতিহ্যের শব্দদ্বয়। তাই স্বভাবত প্রশ্ন জাগে, শহীদ ও মিনারের পাশে বেদী শব্দ কিভাবে আসতে পারে? তীর্থ যাত্রা যেমন হজ যাত্রা নয়, জিয়ারত মানে দর্শন নয়, ওজু মানে হাত-মুখ প্রক্ষালন নয়, গোসল ও স্নান এক নয়, একের বিকল্প অন্য নয়, সহ-অবস্থানও সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে শহীদ মিনারে বেদীর অবস্থান নয়। যদি বেদীই রাখতে হয়, তাহলে শহীদ ও মিনার শব্দ থাকতে পারে না আর শহীদ ও মিনার যদি থাকে, তাহলে বেদী থাকতে পারে না। যদি বেদী রাখার জন্য জেদ ধরা হয়, তাহলে বলতে হবে 'ভাষা আন্দোলনে যারা নিহত

www.pathagar.com

হয়েছে, তাদের সম্মানে স্মৃতিসৌধের বেদীতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয় বা করা হচ্ছে'। এভাবে বললে একটা মিল থাকে। তাই বেদী, শহীদ আর মিনার পরস্পর বিরোধী। বেদীতে ফুল দিয়ে পূজা করা যায়, কিন্তু এই পূজা দ্বারা শহীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যায় না, শহীদের মাগফিরাতও কামনা করা যায় না। যেখানে মসজিদ সেখানে আযান, নামাজ, এবাদত। যেখানে মন্দির সেখানে পূজা, অর্চনা, কীর্তন, দেব-দেবীর মূর্তি। স্বতন্ত্র অবস্থান, স্বতন্ত্র কর্মসূচি, স্বতন্ত্র নিয়ম-কানুন। এই স্বাতন্ত্র্যেই সম্প্রীতি, মিলনে সংঘাত। অতএব পূজার বেদী শহীদের মিনারে থাকা মানে শহীদের অবমাননা, মিনারের অমর্যাদা। পূজার বেদী পূজা মণ্ডপেই মানায়, পূজা মণ্ডপই বেদীর উপযুক্ত স্থান।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড

'এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সবই তাঁর (আল্লাহর) দান'। কোনো কোনো মুসলিম লেখক বা ইসলামী চিন্তাবিদ বলে খ্যাত ব্যক্তিরা নিজ নিজ লেখায় 'বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড' দিয়ে বাক্যও রচনা করেছেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শব্দের অর্থ তারা করেন 'সমস্ত জগৎ', 'ত্রিভুবন' যেমন এই পৃথিবী, আকাশ ও পাতাল। স্বাভাবিক কারণেই মনে প্রশ্ন জাগে, ব্রহ্মার অন্ড থেকে যে ত্রিভুবনের সৃষ্টি, সেই ত্রিভূবনে যা কিছু আছে, সবই তো ব্রহ্মারই দান হওয়ার কথা। সেখানে আল্লাহকে কেন টেনে আনা হয়? ব্রহ্মা-সৃষ্ট দুনিয়াতে লাশরীক আল্লাহ তো পার্টনারশীপ করতে পারেন না। যদি তাই আমরা মেনে নেই অর্থাৎ ব্রহ্মার সাথে আল্লাহর কোন পার্টনারশীপ নেই, তাহলে এসব লেখক বা বক্তা কি ব্রহ্মা ও আল্লাহকে একই অর্থে একই স্রষ্টা মনে করেন (নাউজুবিল্লাহ)?

কালামে পাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার নিজের পরিচয় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে দিয়েছেন। সবচেয়ে সুন্দর পরিচয় তিনি তার সম্পর্কে দিয়েছেন সুরা এখলাসে। স্বয়ং সম্পূর্ণ এই সুরা। মাত্র ৪টি আয়াত। তাতে তিনি বলেছেন, 'বল তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ সব কিছু থেকে নিরপেক্ষ,

www.pathagar.com

মুখাপেক্ষহীন, সব কিছু তারই মুখাপেক্ষী। না তার কোনো সন্তান আছে, আর না তিনি কারো সন্তান এবং কেউ তার সমতুল্য নয়।' সুতরাং যে সব মুসলিম লেখক বিশ্বকে ব্রহ্মার অন্ড থেকে সৃষ্ট বলছেন, আবার সারে জাহানের মালিক আল্লাহকেও বলছেন, তারা সত্যিই অজ্ঞতার অন্ধকারে যেন ঘুরছেন।

হিন্দু শাস্ত্রে ব্রহ্মা তাকেই বলা হয়, যিনি বিষ্ণু ও শিবের সমকক্ষ প্রধান দেবতা, সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা, চতুরানন, কমলাসন, প্রজাপতি, বিরিঞ্চি, হিরণগর্ভ, স্বয়ম্ভু, লোক পিতামহ। অপরদিকে আল্লাহর কোন সমকক্ষ নেই, কোন শরীক নেই, তিনি একক। হিন্দু সম্প্রদায়ের এক দেবতার নাম ব্রহ্মা। তাদের মতে, তিনি এই বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করেছেন। তার স্ত্রীকে বলা হয় ব্রহ্মানী। ব্রহ্মাণ্ড অর্থ ব্রহ্মের অণ্ড, অণ্ডকোষের বীচি। হিন্দুদের ধারণা, এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মের অণ্ড থেকে। এক শ্রেণীর হিন্দু শাস্ত্রকারকের মতে, এই বিশ্ব হচ্ছে ব্রহ্মের অণ্ডের বীচির মতো। যে অর্থেই এ শব্দের ব্যবহার হোক না কেন, যারা এর ব্যবহার করবেন, তারা সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসীর মধ্যে শুমার হবেন। আক্বিদাগত কারণেই মুসলমানরা এ শব্দের ব্যবহার করতে পারেন না।

বিসমিল্লায় গলদ

ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে 'সূচনাতেই ভুল বা ত্রুটি'। এই শব্দ যে সব মুসলিম লেখক ব্যবহার করেন, তারা শব্দটির অর্থ, ভাবার্থ এবং ঈমান-আক্বিদার দিকটি চিন্তা করে ব্যবহার করেন কিনা তা জানি না। চিন্তা-ভাবনা করে ব্যবহার করলে নিশ্চয়ই কোনো মুসলমান এর ব্যবহার করতে পারতেন না। ভুল করে বা বেখেয়ালে যারা ব্যবহার করেন, আল্লাহ তাদের মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু যারা জেনে বুঝে ব্যবহার করেন, তারা কবিরা গুণাহ করেন। ঈমানের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করেন। তারা জানেন কিনা যে, এই শব্দটির আবিষ্কারক মুসলিম বিদ্বেষী লেখক? তারা

www.pathagar.com

বিসমিল্লায় গলদ দেখিয়ে বিসমিল্লাহভিত্তিক ইসলামের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে গলদ প্রমাণ করতে চান। তারা তাদের চিন্তা অনুযায়ী হীনমন্যতার পরিচয় দিতে পারেন। কিন্তু মুসলমান লেখকরা কিভাবে তাদের অনুসরণ করে নিজেদের ঈমানের গলায় ছুরি চালাতে পারেন, তা আমার বুঝে আসে না।

ইসলামে বিসমিল্লাহর গুরুত্ব কতো গভীর অর্থবহ, ব্যাপক, বরকতময়, তা প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানই জানেন। কালামে পাকে একটি মাত্র সুরা ছাড়া প্রত্যেক সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহ ব্যবহার স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেছেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার পবিত্র জিন্দেগীতে যতো কাজ করেছেন, সব কাজের শুরু বিসমিল্লাহ দিয়ে করেছেন। আল্লাহর রসূল (সাঃ) কে অনুসরণ করেছেন সকল সাহাবী এবং সাধারণ মুসলমান। এই সিলসিলা এখনো জারি আছে এবং রোজ কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করলে আল্লাহ বরকত দেন কাজে। কাজের জটিলতা দূর করে সহজ সম্পন্নের সহায়তা করেন আল্লাহ পাক। এই বরকতময় বিসমিল্লাহতে কেমন করে গলদ থাকতে পারে, তা বোধগম্য নয়। আরম্ভে ভুল-ত্রুটি অর্থে যারা বিসমিল্লাহকে গলদের বাহন বানিয়েছেন, তাদের মতলব ছিল খারাপ। মুসলমানদের মধ্যে যারা এ শব্দকে ব্যবহার করেন, তারা কি চিন্তা করে দেখেছেন যে, বিসমিল্লায় যদি গলদ থাকে, তাহলে 'শুদ্ধ' আর কোথায় পাওয়া যাবে?

গোড়ায় গলদ, সূচনায় গলদ, মূলে ভুল, শুরুতেই ভুল-এসব শব্দ দ্বারা সুন্দরভাবে ভাব প্রকাশ করা যায়। 'বিসমিল্লাহতে গলদ' এ শব্দ লেখার সময় মুসলিম লেখকের তো হাত কাঁপার কথা। আমরা এ ভুল আর যেন না করি।

বিদ্যাপীঠ

অধ্যয়ন, অনুশীলন ও অধ্যবসায় দ্বারা লব্ধ জ্ঞানই বিদ্যা। পীঠ অর্থ মন্দির, বেদী ইত্যাদি। প্রাচীনকালে গুরুর পাদপীঠে অর্থাৎ পা রাখার স্থানে শিষ্যরা বসে ধর্মশাস্ত্র চর্চা করতেন। মধ্যযুগে এমনকি আধুনিক যুগের প্রথম

www.pathagar.com

কয়েক শতাব্দীতেও পীঠ বলতে মন্দিরকে বুঝাতো। কারণ, সেকালে হিন্দুদের বিদ্যা চর্চা মন্দিরভিত্তিক ছিল। মন্দির থেকে বিদ্যা চর্চা যখন পৃথক স্থানে চলে যায়, তখন নাম দেয়া হয় বিদ্যালয়। আধুনিককালের অনেক মুসলমানও বিদ্যাপীঠ শব্দটি ব্যবহার করে বিদ্যালয়কে বুঝিয়ে থাকেন। সাংস্কৃতিক দাসত্ব একেই বলে। বিদ্যালয়, শিক্ষালয়, জ্ঞানালয় প্রভৃতি শব্দই তো উপযোগী শব্দ। নিজ সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক যে কোন ধর্মের শব্দকে এড়িয়ে চলা তাকওয়ার দাবি।

ভাবমূর্তি

ইংরেজি শব্দ Image-এর বাংলা তরজমা করা হয়েছে ভাবমূর্তি। ইংরেজি ইমেজ শব্দের বাংলা তরজমা দাঁড়ায় প্রতিফলন, ছায়া, আয়নায় বস্তুর বা ব্যক্তির যে ছায়া পড়ে তাও ইমেজ। ভাবমূর্তির অর্থ করা হয়েছে 'ধ্যান বা কল্পনার দ্বারা গঠিত মূর্তি।' শব্দটির ব্যবহার আমরা এভাবে করি। যেমন 'বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিদেশে যাতে বৃদ্ধি পায় এভাবে প্রবাসীদের চলাফেরা ও জীবন-যাপন করা উচিত'। মুসলমানরা বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরা আকিদাগত কারণে ইমেজের এ তরজমা গ্রহণ করতে পারে না। মূর্তি পাথরের হোক, খড়-বাঁশ ও মাটির হোক অথবা ভাবের বা কল্পনারই হোক, মূর্তি তো মূর্তি। এ মূর্তিকে পূজা করা হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসে না। মুসলমানদের কাছে মূর্তিযুক্ত শব্দ আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম এই দুনিয়াতে এসেছে মূখ্য যে ক'টি কাজ করতে তন্মধ্যে একটি হলো মূর্তির উৎসাধন, তা কল্পনার মূর্তি হোক বা বাস্তবের মূর্তি হোক। মূর্তি পূজারী যারা আছে তারা মূর্তিকে পূজা করুক, মূর্তি নির্মাণ করুক, তাদের পরিধিতে যা ইচ্ছা তাই করুক। ইসলামের পরিধিতে এর প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। যারা মাটি দিয়ে মূর্তি না বানিয়ে ভাব দিয়ে মূর্তি বানিয়ে মুসলমান দ্বারা সুকৌশলে ব্যবহার করাচ্ছেন, তারা সত্যিই ধূর্ত আর মুসলমানরা সেই ধূর্তদের জালের শিকার।

www.pathagar.com

দেশের ইমেজ বৃদ্ধি মানে দেশের ইজ্জত বৃদ্ধি, সম্মান বৃদ্ধি, মর্যাদা বৃদ্ধি। ভাবমূর্তি বৃদ্ধি তো বেমানান। ভাবমূর্তি বিশেষ এক সম্প্রদায়ের কাছে পরিচিত, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদা পরিচিত। মূর্তি নিয়ে মূর্তি পূজারীরা থাকুক, আমরা মূর্তির অঙ্গন থেকে বেরিয়ে এসে দেশের ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করি। 'ভাব'কে যদি একান্তই রাখতে হয় তাহলে 'মূর্তি'কে ভাবের সম্মুখ থেকে সরিয়ে 'মর্যাদা' শব্দটি বসাতে পারি। তাহলে শব্দটি হবে ভাব মর্যাদা। বলুন তো 'ভাবমূর্তি' শব্দ থেকে কি 'ভাব মর্যাদা' অবয়বে, সৌন্দর্যে ও ছন্দে খারাপ দেখায় বা শোনায়?

ভেস্ত/হদিস

ভেস্ত আর হদিস এই দু'টি শব্দ বেহেস্ত এবং হাদীস বানানের বিকৃত বানান ও রূপভেদ। কলিকাতার একটি অভিধানেও এ ব্যাখ্যা লেখা আছে। শব্দ দু'টি পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সংবাদ ও প্রতিবেদনের শিরোনামে, বিবরণে ও বয়ানে প্রতিদিন ব্যবহার হচ্ছে। বক্তাদের বক্তব্যেও আসছে। বাংলাদেশে এই শব্দ দু'টির ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় সকলেই। অন্য ধর্মাবলম্বী বাংলা ভাষাভাষীরা কোন্ নিয়তে ব্যবহার করেন তা পরিস্কার। কিন্তু মুসলমানরা কেন তাদের বেহেস্ত ও হাদীসকে বিকৃত বানানে ও বিকৃত অর্থে ব্যবহার করেন, তা আমি বুঝি না। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত সংসদ বাঙ্গালা অভিধান চতুর্থ সংস্করণে ৫৪৯ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, 'ভেস্ত=বেহেশত'-এর রূপভেদ বা বানানভেদ। হাদীস সম্পর্কে ৭১১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, হাদীস আরবী শব্দ। এর থেকে হদিস-এর উদ্ভব। অর্থ হচ্ছে তত্ত্ব, সন্ধান, খোঁজ। কলকাতার বাবু লিখিয়েরা বেহেস্ত ও হাদীসের বানানের বিকৃত রূপ নিয়েও যদি খুশী থাকতেন, আর আগে বাড়তেন না, তাহলে মনে করতাম, স্বভাব দোষে তারা ইসলামী পরিভাষা ও মুসলমানী নামকে বিকৃত বানানে লিখে থাকেন, এ তাদের ফেৎরত। কিন্তু তারা এ পর্যন্ত ইতি না টেনে দুটি পবিত্র শব্দকে বিকৃত বানানে বিকৃত অর্থে অপপ্রয়োগ করে বুঝিয়ে দিলেন যে, যে

www.pathagar.com

সব মুসলমান বেহেশতে যাওয়ার আশা করে, তারা গোল্লায় যায়। আর হাদীস তো খোজাখুজি করার একটি শব্দ। এছাড়া তার কোনো মূল্য নেই।

মুসলমানরা কোনো ভাবনা-চিন্তা ছাড়া বাবুদের কলমের ডগা দিয়ে যা আসে, তা যাচাই-বাছাই না করে বিষকে অমৃত মতে করে গলাধঃকরণ করেন। তারা ভেবেও দেখেন না, আসলে শব্দ দু'টির অরিজিন অবস্থা কি ছিলো, কেন বিকৃত করা হলো, কারা বিকৃত করলো এবং প্রয়োগে কেন অপপ্রয়োগের আশ্রয় নেয়া হলো? না, এদিকে কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। অনেক মুসলমান লেখক, বক্তা নিজ নিজ লেখায় ও বক্তৃতায় এবং সাধারণ শিক্ষিত লোকের আটপৌরে ভাষায়ও বিকৃত বানানের ভেস্ত/হদিস বিকৃত অর্থেই প্রয়োগ হচ্ছে। যারা কথায় কথায় ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টানেন, তারাও পত্রপত্রিকায় লেখেন 'প্রকল্পটি ভেস্তে গেছে' অর্থাৎ গোল্লায় গেছে অথবা 'পুলিশ কোনো হদিস পায়নি আসামির' অর্থাৎ সন্ধান পায়নি।

আগেই বলেছি, শব্দ দুটির বিকৃতরূপ ও বিকৃত বানানের জন্মদাতা এক শ্রেণীর হিন্দু লেখক। মুসলমানদের বেহেস্ত নসীব হওয়াকে বা বেহেস্ত যাওয়ার আশাকে গোল্লায় যাওয়ার অর্থে ব্যঙ্গ করে ব্যবহার করেন। এ কারণে তারা বেহেস্তের শুদ্ধ বানানকে উপহাস করে ভুল বানানে লেখেন। অনুরূপভাবে তারা হাদীসকে হদিস বলেন, বিকৃত উচ্চারণ অনুযায়ী বানানও লেখেন। হাদীসের স্থান আল কোরআনের পরই। কোরআনের ব্যাখ্যাই হচ্ছে হাদীস। হাদীস দিয়েই ব্যাখ্যা জানতে হয় আল কোরআনের অনেক আদেশ-নিষেধের। কোরআনে সালাত আদায় করার হুকুম আছে, নির্দেশ আছে। কিন্তু কিভাবে সালাত আদায় করতে হয়, তার বর্ণনা কোরআনে নেই, তা রয়েছে হাদীসে। এ জন্য নেক নিয়াতে সন্ধান অর্থে তারা হাদীসকে গ্রহণ না করে বিকৃত বানানে, অর্থে, ব্যঞ্জনায় এক সাধারণ শব্দে পরিণত করে ব্যবহার করে থাকেন। কোরআনের পরে যে হাদীসের স্থান, এই হাদীসকে 'হদিস' বানিয়ে যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করা হচ্ছে। পুলিশ আসামি খুঁজে পাচ্ছে না, এ ক্ষেত্রেও 'হদিস' প্রয়োগ হচ্ছে অর্থাৎ পুলিশ আসামির কোনো

www.pathagar.com

হদিস পাচ্ছে না। বাবুর্চি কোথায় চামচ রেখেছে তা খুঁজে পাচ্ছে না, এখানেও 'হদিসের' ব্যবহার। কোথায় তিনি মানিব্যাগ রেখেছেন খুঁজে পাচ্ছেন না, এখানেও 'হদিসের' ব্যবহার। হিন্দু লেখকরা এই দুই শব্দকে বানানে ও অর্থে বিকৃত করে এবং এর প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শব্দ দুটিকে মুসলমানদের বিকৃত ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। মুসলমানরা বাবুদেরই অনুসরণ করছেন বোকার অনুসরণের মতো। এক শ্রেণীর হিন্দু লেখক এতোই মুসলিম বিদ্বেষী, তারা 'মুসলমান' শব্দকে শুদ্ধ বানানে লেখেন না। তাদের লেখায় মুসলমান শব্দ পাওয়া যায় 'মুচলমান' বানানে, ইসলাম পাওয়া যায় 'ঐশলাম' বা 'এশলাম' বানানে। তারা সোহরাওয়ার্দী আর আকরাম খাকে বরাবরই লিখলেন সুরাবর্দি ও আক্রমণ খা বানানে। তাদের বদ নিয়তের বদ মতলবের কারিগরিতে আমাদের পরিভাষার বানানের বিকৃতিকে আর অপপ্রয়োগকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? আমাদের বেহেস্ত ও হাদীসকে বিকৃত বানানে অভিধানে পৃথকভাবে উল্লেখ করে বিকৃত অর্থ আবিষ্কার করার পর হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদেরই উপহার দিলেন, কি জঘন্য ধৃষ্টতা। আর আমরাও ব্যবহার করছি তাদের যোগ্য সেবা দাসদাসীদের ন্যায়। এও এক জঘন্য মানসিকতা!

মধ্যযুগীয় বর্বরতা

'মধ্য যুগীয় বর্বরতা' আমাদের সমাজে লেখায়, বক্তৃতায়, আলাপচারিতায় একটি সাধারণ শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইসলামের দুশমনরা যেমন ব্যবহার করছে, ইসলামপন্থীরাও ব্যবহার করছেন। যারা ব্যবহার করেন, তারা কি জানেন, মধ্য যুগের শুরু কখন থেকে আর শেষ কখন? তারা কি জানেন, এই যুগকে কেন বর্বর যুগ বলা হয়? ১৯৯৩ সালের জুলাইয়ের প্রথম দিকে একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে পর পর দু'দিন তার বিবৃতির এক স্থানে 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাধ্য হয়ে এই বিজ্ঞ লোকের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে একটি সাপ্তাহিকীতে আমি আলোচনা করি।

www.pathagar.com

আসুন, আমরা প্রথমে মধ্য যুগের চৌহদ্দি নিরূপণ করি, অতঃপর আলোচনা করে দেখি, এ যুগকে বর্বর যুগ কেন বলা হলো, কারা বললো? সর্বশেষে আমরা দেখবো, এই শব্দ কি মুসলমানরা ব্যবহার করতে পারেন?

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রামাণ্য ইতিহাসে ও তথ্য গাইডে মধ্য যুগের সময়-সীমানা চিহ্নিত করেছেন '৫ম শতাব্দী থেকে ১৫শ' শতাব্দী পর্যন্ত' পিরীয়ডকে। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, The period from the decline of the Roman Empire in the 5th century to the revival of letters in Europe at the end of the 15th century অর্থাৎ রোমের পতন ও ইউরোপের মুদ্রণ যন্ত্র আবিস্কারের মধ্যবর্তী সময় মধ্য যুগ। এই সংজ্ঞাকে সমর্থন করেছে সর্বজন স্বীকৃত প্রামাণ্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক অভিধান ও বিশ্বকোষ। শুধু ডঃ এন্নানডেল তার কনসাইজ ডিকশনারীতে (৪৩৩ পৃষ্ঠায়) মধ্য যুগের সময়কালের শুরুটা ৩শ' বছর এগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যুগের শেষ সীমানা অপরিবর্তিত রেখেছেন। তিনি বলেছেন, The period extending from the decline of the Roman Empire till the revival of letters in Europe or from the eighth to the middle of the fifteenth century of the christan Era. তার মতে, মধ্য যুগের শুরু অষ্টম শতাব্দী থেকে।

আমাদের বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের ৮৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, মধ্য যুগ ১১শ' শতাব্দী থেকে ১৭শ' শতাব্দী পর্যন্ত। কলিকাতার সংসদ বাঙ্গালা অভিধান একই মত পোষণ করে। একটার নকল অন্যটি। সুতরাং মত অভিন্ন হওয়ার কথা। তবে এ মতের সমর্থনে আর কেউ নেই। সুতরাং এ মত গ্রহণযোগ্য নয়।

ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামসের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত জুলাই ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত বাংলা বিশ্ব কোষের তৃতীয় খণ্ডে ৬২৮ পৃষ্ঠায় মধ্য যুগ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসে একটি সময় বিভাগ। এই যুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। এর সঠিক সময় নির্দেশ করা

www.pathagar.com

সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের পতন কাল থেকে শুরু করে ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দ, কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের সময় পর্যন্ত মধ্য যুগ বলা যায়।

আমার মতে ডঃ এন্নানডেলের ব্যাখ্যাই সঠিক। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময় আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ। ইসলামের অভ্যুদয়ের, প্রসারের, বিজয়ের সময়কাল মধ্য যুগের অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানদের প্রশাসনিক পতনও ইউরোপের শিল্প বিপ্লব থেকে শুরু হয় আধুনিককাল। সুতরাং মধ্যযুগকে বলা যায় ইসলামের যুগ।

ইসলামের যুগ এই মধ্যযুগকে কেন বর্বর যুগ বলা হলো এবং কারা বললো, তা আমাদের দেখতে হবে। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইউরোপে নতুন ধারা প্রবর্তন এবং মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের সাথে সাথে মধ্যযুগের অবসান ঘটে। ইসলামের বিজয় অভিযানে খ্রীস্টান জগত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এদিকে স্পেনে মুসলমানদের জ্ঞান চর্চা ইউরোপকে তথা খ্রীস্টান জগতকে নাড়া দেয়। খ্রীস্টানরা পশ্চিম ইউরোপকে কেন্দ্র করে মধ্য যুগে উত্থানের চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। মধ্যযুগের প্রথম দিকে এমনকি মধ্যম পর্যায়েও খ্রীস্ট ধর্ম ও খ্রীস্টানরা ইউরোপে ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়ে দিন কাটাচ্ছিলো। তারা প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজছিলো। কিন্তু মধ্য যুগের ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। তখন তারা ইসলামের এই যুগকে বর্বর যুগ বলতে শুরু করে। মধ্য যুগ অর্থাৎ ইসলামের আধিপত্যের যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইউরোপে বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে পুনর্জাগরণ ঘটে এবং তা খ্রীস্টানদের নেতৃত্বেই ঘটে। তারা তখন নতুন করে ইতিহাস লিখতে শুরু করে। খ্রীস্টানদের উত্থানের যুগে শাসন দণ্ড ও কলম দু'টিই তাদের হাতে ছিলো। মুসলমানদের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাসকে তারা বিকৃত করতে থাকে। সে ইতিহাসই পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে পাঠ্য পুস্তক হয়ে যায়। তাদের লেখা ইতিহাস পাঠ করেই আমরা শিখলাম মধ্যযুগ বর্বর যুগ। মধ্যযুগের সব কিছুকে তারা বর্বরতার সাথে তুলনা করতে থাকে। মুসলমানরা নিজেদের ইতিহাস পাঠ ছেড়ে দেয়। ইংরেজ লেখকদের ইতিহাস

www.pathagar.com

থেকে পাঠ নিতে শুরু করে। তারা তখন বলতে থাকে, মধ্যযুগ ছিলো অন্ধকার যুগ। তারা একবার ভেবেও দেখে নি যে, এই মধ্যযুগে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের জন্ম হয়। হেরার রোশনী দুনিয়ার অন্ধকার দূর করে। জাহেলিয়াতকে ধ্বংস করে জাহেলিয়াতের ধ্বংসাবশেষের ওপর ইসলামের বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করে। মধ্যযুগের ৮শ' বছর স্পেনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্ণাধারা থেকে ইউরোপের খ্রীস্টান জ্ঞান-পিপাসার্তরা আসতো জ্ঞান বারি পান করতে। ইবনে সিনা, আল গাজ্জালী, আল ফারাবী, ইবনে খালদুন এরা তো সবই মধ্যযুগের স্বর্ণ ফসল। এম আকবর আলীর 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান' পুস্তকগুলোর পৃষ্ঠা উল্টালেই তারা বুঝতে পারবেন, মধ্য যুগ অন্ধকার না আলোকময় ছিলো।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক শামস উদ্দিন মিয়া (ইতিহাসে গোল্ড মেডেলিস্ট) তার Islam and the modern world পুস্তকে লিখেছেন, Mediaeval age was not the dark age. That age was the age of the most civilized and enlightened nation. Mediaeval age is the mother of modern age. Ethical values of mediaeval age were so high, refined as well as logical and scientific that modern age is far behind of mediaeval standard. অর্থাৎ মধ্যযুগ অন্ধকার যুগ ছিল না। এই যুগ ছিলো সবচেয়ে সভ্য এবং আলোকিত জাতির যুগ। মধ্যযুগ হচ্ছে আধুনিক যুগের জননী। মধ্য যুগের নৈতিক মূল্যবোধ এতো উচ্চ, পরিশীলিত এবং যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলো, যার অনেক পিছনে বর্তমান যুগ রয়েছে।

স্টেনলি লেন পুল, হিট্টি, মুয়ীর, টয়েনবির মতো ঐতিহাসিকরা মধ্য যুগ সম্পর্কে একই রায় দিয়েছেন।

মধ্যযুগে যারা বর্বর জীবন-যাপন করতো, তারা মুসলমান ছিলো না। ছিলো ভিন্ন জাতি, যারা আধুনিক যুগে সভ্য হয়েছে। স্পেনের কর্ডোভায় ও আন্দালুসিয়ায় এবং নিশাপুরে লেখাপড়া করে শিক্ষিত হয়েছে। বর্বর মানুষ সব যুগে থাকে এবং মধ্যযুগেও ছিলো।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের বর্বররা বর্বর ছিলো বটে, কিন্তু আধুনিক যুগের বর্বরদের চেয়ে অনেক অনেক সভ্য ছিলো। সে যুগের বর্বররা মানুষ খুন করে লাশকে অক্ষত রাখতো। কিন্তু আধুনিক বর্বররা খুন করে লাশকে কেটে কুটি কুটি করে বাক্সতে ভরে রাস্তায় ফেলে দেয়।

যে সব মুসলমান 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' শব্দ ব্যবহার করেন, তারা তো প্রকারান্তরে নিজেদেরই বর্বর বলছেন, তাকি তারা খেয়াল করে দেখেছেন? মধ্যযুগে আমরা যে দ্বীন, শরীয়ত, কোরআন, হাদীস, ফেকাহ পেয়েছি, তাতে উল্লেখিত বিধান অনুযায়ী আমাদের নাম, আমাদের পরিচিতি, আমাদের বিবাহ, আকীকা, খতনা, নামাজ, রোজা, অযু, গোসল, সামাজিক বন্ধন সবই, আমরাই মধ্যযুগের গর্ভজাত সন্তান। এখন যদি মধ্যযুগকে আমরা বর্বর যুগ বলি, মধ্যযুগের বোধ আর মূল্যবোধকে আমরা বর্বরতা বলি, তাহলে সে যুগের গর্ভ থেকে যাদের জন্ম, সেই মূল্যবোধে যারা মানুষ, তারাও বর্বর। যিনি 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' শব্দ ব্যবহার করেন, তারাও বর্বর। তাহলে আমাদের অস্তিত্ব থাকছে কোথায়?

আমার মা যদি অসুন্দরীও হন, তবুও তিনি আমার মা। আমি পারি না, আমার মার রূপের নিন্দা করতে। যে সন্তান তা করে সে বর্বর ও কুলাঙ্গার। অথচ নিজের মা তো পরমা সুন্দরী, এই গর্ভে আমার জন্ম। এ জন্য আমার গর্ব হওয়া উচিত। তারা ইতিহাসের আয়নায় যুগের চেহারাও দেখছে না, জানছে না, কোন্ গর্ভ থেকে তাদের জন্ম। ওরা বড়ই বদ নসীব।

মধ্যযুগ আমাদের গৌরবের যুগ। বর্বরতা সব যুগের বর্বররাই করেছে, এখনো করছে। আগামীতেও করবে। সময়, কাল যুগকে গালি দিতে নেই। আল্লাহই মানা করেছেন। 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' এ শব্দের মানেটা কি? ইসলামের যুগকে গাল দেয়া ছাড়া আর কোনো মানে নেই।

দুশমনদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাদের বুলি মুখে বা কলমে নিয়ে আত্মঘাতি প্রয়োগে আর যেন আগ্রহ প্রকাশ না করি। কোন্ কথা, কোন্ শব্দ আমাদের জন্য ভালো আর কোন্টা মন্দ, তা বুঝার তওফিক যেন আল্লাহ আমাদের দেন।

www.pathagar.com

মানুষের ভুল আছে শয়তানের ভুল নেই

যে সব মুসলমান এ কথা বলে থাকেন, তারা শয়তানকে ভুলের উর্ধে বোধহয় মনে করেন। শয়তানের জন্মই তার কৃত ভুল থেকে। শয়তান কোন শুদ্ধ কর্ম করতে পারে না। ভুল তার জীবন-ধর্ম। মানুষের ভুল কখনো কখনো হয়। কিন্তু শয়তানের ভুল সদা সর্বদা। শয়তান তো ভুলের মাঝেই আছে। ভুল থেকে তার জন্ম।

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা

জন্ম ও মৃত্যু আল্লাহর হাতে। কার গর্ভে, কার ঔরসে কার জন্ম হবে বা কোন্ দেশে হবে তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই ফয়সালা করে থাকেন। একইভাবে মৃত্যুও অনিশ্চিত। কার মৃত্যু কখন হবে, কিভাবে হবে এবং কোথায় হবে, সেই আগাম খবর মৃত্যু বরণকারীর কাছেও থাকে না। কাকে তিনি মারবেন আর কাকে বাঁচাবেন, তা তিনিই জানেন। আমরা দেখি, সামান্য অসুখে বা অসুখ ছাড়াই একটি লোক মারা গেলো। আবার বিপরীতও দেখি। কঠিন রোগে দীর্ঘ দিন ভোগে একটি লোক আরোগ্য লাভ করে ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে আছে অথচ অসুখের এক পর্যায়ে আত্মীয়-স্বজনরা এমনকি ডাক্তাররা পর্যন্ত রোগীর নিরাময়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অপেক্ষায় ছিলেন কখন মারা যায়-এ সংবাদ শোনার জন্য। এই যখন মানুষের অবস্থা, তখন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করা বা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার শক্তি তো রোগীর থাকার কথা নয়। রোগী তো দুর্বল। বিছানায় পড়ে থাকা ছাড়া তার করার মতো আর কি আছে? ডাক্তার-নির্ভর রোগী অসহায়। নিজেই দুর্বল, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার শক্তি তার কোথায়? রোগীকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইতে যারা নামায়, তাদের জিজ্ঞেস করি, যখন লোকটি রোগী হয়নি, দেহে ছিলো শক্তি, তখন কেন এই লোকটিকে রোগের সঙ্গে লড়াইতে নামান্‌নি? তাহলে তো সে

www.pathagar.com

রোগী হতো না। আর রোগীর দুর্বল দেহ নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার ধৃষ্টতাও দেখতো না।

মৃত্যুকে মুকাবিলা করা যায় না, পাঞ্জা বা কুস্তি কোনটাই চলে না। রোগ আল্লাহ দেন, চিকিৎসা জ্ঞানও তারই দান। তিনি ইচ্ছা করলে নিরাময় করবেন, ইচ্ছা করলে আমৃত্যু ভোগাবেন। আবার কিছু দিন ভোগানের পর তার কাছে ফিরিয়েও নিতে পারেন, সবই তার ইচ্ছা। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার কথা বলে প্রকারান্তরে আমরা আল্লাহর শক্তির মুকাবিলায় মানুষকে দাঁড় করাচ্ছি। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, 'মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা' এ কথা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে বা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার কথা বুঝানো হচ্ছে না। রোগীর ভোগান্তি যে প্রকট, রোগীর অবস্থা যে খুবই খারাপ, শুধু তাই বুঝানো হচ্ছে। আমার উত্তর, যদি তাই বুঝানো হয়, তাহলে রোগীকে পাহলোয়ান হিসাবে দাঁড় না করিয়ে রোগীর প্রকৃত অবস্থা বুঝানোর জন্য শব্দের কি আকাল পড়েছে? 'পাঞ্জা ধরার লড়াই' শব্দগুলো নির্দোষ। কিন্তু এ শব্দগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্র ভিন্ন। রোগীকে দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরার লড়াই কেন? আমি নিশ্চিত, শয়তান এমন ব্যবহারের জন্য আমাদের প্ররোচিত করে। শয়তান কুফরী কালাম আমাদের দিয়ে উচ্চারণ করায়।

বিশ্বের এমন কোন শক্তিমান ব্যক্তির নাম কি আমরা জানি, যিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছেন, অমরত্ব লাভ করেছেন? যদি এমন দৃষ্টান্ত না থাকে, তাহলে ঈমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক শব্দ দিয়ে কেন এমন বাক্য তৈরি করি? 'মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা' ভিন্ সংস্কৃতির শব্দ নয় বটে, তবে বাক্য গঠনের বেলায় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, শব্দ ব্যবহারে ঈমানের চৌহদ্দি অতিক্রম করছি কিনা। মুসলমানরা তো এমন শব্দ ব্যবহার আলাপচারিতায় বা লেখায় করতেই পারেন না। আল্লাহর শক্তি ও কুদরতের কাছে আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম। বিপদ আল্লাহ দেন, তিনিই বিপদ মুক্ত করেন। জীবন তারই দান, মৃত্যু তারই হুকুম বা ফরমান। রোগী মাত্রই অসহায় ও দুর্বল। এই দুর্বলদের পাঞ্জা বা লড়াইতে আর কেউ নামবেন না।

www.pathagar.com

মরণের সঙ্গে পণ যোগ করে 'মরণ পণ' লড়াইও আমরা প্রায়ই করছি। পণ অর্থ বাজি, প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় সংকল্প ইত্যাদি। আপনি মহৎ উদ্দেশ্যে জেহাদ করবেন, লড়াই করবেন, যুদ্ধ করবেন। আপনার মূল লক্ষ্য থাকবে আল্লাহর রেজামন্দি। সেই রেজামন্দি আল্লাহ আপনাকে দেবেন কিসের বিনিময়ে, আপনার প্রাণের বদলে, মরণের বদলে, না আপনাকে জিন্দা রাখার বদলে, না আপনার দান-খয়রাত, না এবাদতের বদলে? তা আল্লাহই ভালো জানেন। আপনি কিন্তু নিজেই শর্ত দিয়ে লড়াইতে নামলেন, যদি আপনি লড়াইতে জানটা দেয়ার সুযোগ না পান, তাহলে আপনার ঘোষণা তো মিথ্যা প্রমাণিত হলো। কারণ, মরণ তো আল্লাহর হাতে, তার হাতের বস্তুকে আপনি বাজি রাখার কে? জীবন পণ বা জীবনের বাজিও মরণ পণের মতোই শব্দ। জীবন, মরণ বা মৃত্যুকে আমরা পণ বা বাজি রাখার অধিকার রাখি না। এ ধরনের ঘোষণা আত্মহননের শামিল। আপনি মহৎ লক্ষ্যে, নেক নিয়তে দক্ষতার সঙ্গে সংগ্রাম করে যান। আল্লাহ আপনার মেহনত কিভাবে কবুল করবেন, তা তিনি জানেন। জীবনপণ, মরণপণ আর বিয়ের পণের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতার পার্থক্য থাকলেও চরিত্রগত পার্থক্য নেই। হ্যাঁ, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার তামান্না প্রত্যেক মুসলমানের থাকা উচিত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামের দুশমনের সামনে গিয়ে স্বেচ্ছায় বুকে বুলেট নেয়া। ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু শহীদের কথা জানা যায়, যারা বীরের মতো লড়াই করে অবশেষে শহীদ হয়েছেন। নিজের প্রাণ চলে যাওয়ার আগে বহু দুশমনকে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। মরণপণ লড়াই আর শহীদের জেহাদ এক কথা নয়। এসব শব্দের ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক থাকা উচিত মনে রাখতে হবে, ছিনতাইকারীরাও মরণপণ করে বা জীবনের বাজি রেখে পেশায় নামে, মৃত্যুবরণ করে, বিনিময়ে সে পায় জাহান্নাম।

www.pathagar.com

মুখে ফুল চন্দন পড়ুক

এ কথা মুসলমানরা কখনো উচ্চারণ করতে বা লিখতে পারেন না। কারণ, ঈমানের বাধা আছে। কেউ যদি অন্যকে কোন আশার বাণী শোনায়, তাহলে আশার বাণীর শ্রোতা সংবাদদাতাকে বলেন, 'আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ক'। অর্থাৎ আপনার কথা যেন সত্য হয়। ফুল চন্দন তো সংবাদদাতাকে দিলেন, কিন্তু কি দিলেন, তা কি জানেন?

হিন্দুদের পূজার বিশেষ উপকরণের অন্যতম হচ্ছে চন্দন মাখানো ফুল, যা দিয়ে দেবতার পূজা করা হয়। এবার বলুন তো, চন্দন মাখানো দেবতার ফুল কি এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে দিতে পারেন? ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তা কবিরা গোণাহর শামিল। পূজাধর্মী এমন উক্তি থেকে আমাদের অবশ্য বিরত থাকা উচিত।

মহাভারত কি অশুদ্ধ হয়ে গেল?

মুসলমানরাও কোন কথা প্রসঙ্গে মহাভারতের উপমা টানেন। যেমন বলে থাকেন, 'যদি আমি এমন বলেও থাকি তাহলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেলো?' যারা এভাবে উপমা দেন, তারা নিশ্চয়ই জানেন, মহাভারত আসমানি কোনো কিতাব নয়, এমন কি সাধারণ অর্থে কোন ধর্মগ্রন্থও নয়। তাই মহাভারতে সত্যাসত্য বা শুদ্ধ-অশুদ্ধের উপমা দেয়াই অশুদ্ধ। মহাভারত একটি কাব্য গ্রন্থ মাত্র। তাতে ধর্মীয় কাহিনী আছে, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ আছে। কিছু সত্য আছে, অধিকাংশ অসত্য, কাল্পনিক। এই অর্থে মহাভারতই অশুদ্ধ, অন্তত অধিকাংশ তো অশুদ্ধই। কল্প কাহিনীর কাব্যকে ধর্মীয় কাঠামোতে বিচার করা যায় না।

মহাভারত সম্পর্কে হিন্দু পণ্ডিতরা কি বলেন শুনুন :

'The Mahabharata could not have seen the work of any single person, and in order to be brought upto its present size the process of interpolation must have

www.pathagar.com

gone on for several centuries. It can not, therefore, be said that the Mahabharata depicts the state of India at any particular period' R.D. Banarjee : Pre-historic Ancient and Hindu India p-47

আরডি ব্যানার্জির মতের সঙ্গে একমত হয়ে ডঃ কিরণ চন্দ্র চৌধুরীও বলেছেন, 'গাথা ও নারাশংসি' অর্থাৎ মানব গুণগাথা হইতেই ক্রমে মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্যের উদ্ভব হইয়াছে। মহাভারত বা রামায়ণ কোন এক ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ নয়। যুগ যুগ ধরিয়া গাথাজাতীয় কবিতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে এগুলি মহাকাব্যগ্রন্থাকারে রূপ লাভ করে। সুতরাং মহাভারত বা রামায়ণ কোন একটি বিশেষ যুগের বিবরণ নহে। ভারতের ইতিহাস কথা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০।

আরডি ব্যানার্জি তার এই গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, The Mahabharata is a story or a hero-land belonging to the later vedic period.

আশা করি, আর প্রমাণের দরকার নেই। মহাভারত অনেক কবির দ্বারা বিভিন্ন কাল্পনিক ঘটনার কাব্যিক কল্পনা প্রসূত কবিতা বিশেষ। সুতরাং যারা মহাভারতের রেফারেন্স দেন, তারা সত্যের ভুল রেফারেন্স দেন।

যক্ষের ধন

যক্ষের ধন শব্দটি অনেক মুসলিম লেখকের লেখায় আসে। সাধারণ আলাপচারিতায়ও শব্দটি অনেকে ব্যবহার করেন। 'যক্ষের ধন' শব্দটির দু'টি অর্থ। প্রথম অর্থ কুঞ্জুসের ধন বা কৃপণের ধন। দ্বিতীয় অর্থ দেবযোনী বিশেষ। দেবযোনী হচ্ছে ভূত-প্রেতাদি, উপদেবতা। এই যক্ষ থেকেই যক্ষপতি, যক্ষরাজ ও যক্ষপুরী শব্দের উদ্ভব। কথিত আছে, কৈলাস পর্বতের উপরে কুবেরের রাজধানী অলকা অবস্থিত।

ভূগর্ভে প্রোথিত অর্থরাশির রক্ষক প্রেতযোনী। বলা হয়ে থাকে, অনেক

www.pathagar.com

অনেক দিন আগে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঞ্চিত ধনরত্নসহ একটি জীবন্ত বালককে ভূগর্ভে সমাধি দেয়া হয়। যাতে ঐ বালক মৃত্যুর পর যক্ষরূপ ধারণপূর্বক উক্ত ধনরাশি রক্ষা করছে।

কৃপণেরা অন্ধ সংস্কারের বশে এ অনুষ্ঠান করতো। এখনো কোন কোন কৃপণ ধণাঢ্য হিন্দু যক্ষ দেবতার পূজা করে ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য। যক্ষ হলো ধনাদির অধিদেবতা কুবের। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম সমাজে 'যক্ষের ধন' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, মায়ের একমাত্র সন্তান, সব সময় মা তাকে কাছে কাছে রাখেন, যেন যক্ষের ধন অথবা ওর থেকে কিছু আদায় করা যাবে না, তার প্রতিটি টাকা যেন যক্ষের ধন। আমার বুকের মাণিক, আমার যক্ষের ধন ইত্যাদি নানা কথায় শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে। মুসলমানরা তা ব্যবহার করতে পারেন না। কারণ, এ বিশ্বাস হচ্ছে ঈমান-আক্বিদা বিরোধী। কঞ্জুস অর্থে যদি যক্ষের নাম ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে আমরা সে প্রয়োজন পূরণ করতে পারি কারুণের নাম উচ্চারণ করে। যক্ষ কাল্পনিক নাম, কারুণ বাস্তব এক মানুষের নাম। আসুন, আমরা ইতিহাসকে গ্রহণ করি, বানোয়াট গল্পকে বর্জন করি।

লক্ষ্মী

শুধু হিন্দুদের মধ্যেই নয়, মুসলমানদের মধ্যেও লক্ষ্মী কেন্দ্রিক, লক্ষ্মীভিত্তিক ও লক্ষ্মী যুক্ত সম্বোধন প্রায়ই শোনা যায়, এমনকি মুসলমানদের লেখায়ও দেখা যায়। হিন্দুরা লক্ষ্মী শব্দ ব্যবহার করেন সঙ্গত কারণে। কারণ, তাদের দেবীর নাম তারা উচ্চারণ করবেনই, এ নাম তাদের লেখালেখিতেও আসবে। লক্ষ্মী মা, লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী সোনা, লক্ষ্মী মেয়ে, এসব সম্বোধন মুসলমান পরিবারে এতো আ'মভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা শুনলে মনে হয়, 'লক্ষ্মী' শব্দটি হিন্দু-মুসলমানের কমন শব্দ। প্রকৃতপক্ষে এ যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি মুসলমানদের আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, মুসলমানদের সংস্কৃতি ভান্ডারে কি শব্দের এতোই আকাল পড়েছে

www.pathagar.com

যে, লক্ষ্মীর বিকল্প কোন শব্দ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? যদি না থাকে, তাহলে নাইবা উচ্চারণ করলাম। কিন্তু তাই বলে কি লক্ষ্মীর পিছনে ঘুরে জাত-ধর্ম খুয়াবো? মেয়েটি কতো ভালো বা ছেলেটি কতো ভালো, এমন সম্বোধন করলে কি বাক্য ভুল হয়ে যায়? কি হীনমন্যতা রোগে আমরা ভুগছি!

হিন্দু ধর্ম মতে, লক্ষ্মী হলেন বিষ্ণুপত্নী। তিনি ধন-সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি কমলা, রমা, সৌভাগ্য, শোভা, ইন্দিরা, পদ্মা, পদ্মালয়া প্রভৃতি নামেও হিন্দুরা লক্ষ্মীকে সম্বোধন করে থাকেন। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। পেঁচা তো অশুভের প্রতীক। সমীকরণটা তাহলে কিভাবে হলো?

হিন্দুদের মতে, লক্ষ্মীর সুনজরে যারা আছেন, তারা হোন সৎ, শান্ত, সুবোধ ও ধনবান। আর যাদের ওপর লক্ষ্মীর সুনজর নেই অথবা লক্ষ্মী যাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তারা হন হতভাগা, দুষ্ট, দরিদ্র এবং অশান্ত। এ হচ্ছে হিন্দু শাস্ত্রীয় বিশ্বাস। এবার বলুন তো, তাদের এই শাস্ত্রীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে আমরা অর্থাৎ মুসলমানরা কি লক্ষ্মীকে দেবতা মেনে তার নাম সব সময় জপ করতে পারি? লক্ষ্মী নাম কি আমরা উপমায় আনতে পারি? যদি আনি, তাহলে আমাদের ঈমান থাকছে কোথায়?

হিন্দুরা লক্ষ্মীর পূজা করেন। দূর্গাপূজার অব্যবহিত পরের পূর্ণিমাকে হিন্দুরা লক্ষ্মী পূর্ণিমা বলে থাকেন। মুসলমানরা লক্ষ্মী পূজা করেন না, লক্ষ্মী পূর্ণিমার অনুষ্ঠানও করেন না, কিন্তু লক্ষ্মীর নাম প্রায়ই মুখে নিয়ে ঈমানের বিরুদ্ধে কেন ভূমিকা রাখেন, তা বোধগম্য নয়।

একজন মুসলমানের স্ত্রী অবশ্যই মুসলমান, মুসলমান স্বামী-স্ত্রীর সন্তানও মুসলমান। যদি তাই হয়, তাহলে তাদের ছেলেমেয়ে কেমন করে লক্ষ্মী ছেলে আর লক্ষ্মী মেয়ে হয়? মুসলমানের ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে লক্ষ্মী মা লক্ষ্মী বাবা কেমন করে বলতে পারে? পরিবারে পারস্পরিক সম্বোধনের ভাষা যদি এই হয়, তাহলে তাদের ছেলেমেয়ে কেমন করে হবে রসুল (সাঃ)-এর আদর্শের অনুসারী? যেখানে লক্ষ্মী সেখানে হিন্দু ধর্ম, সেই সংস্কৃতি, সেই কৃষ্টি, সেই ধর্মের আমেজ ও মেজাজ থাকবেই। যেখানে লক্ষ্মী সেখানে আল্লাহর রহমত তো বর্ষণ হতে পারে না।

www.pathagar.com

লক্ষ্মীর জায়গায় লক্ষ্মী আছেন এবং থাকবেনও তাদের জন্য, যাদের কাছে তিনি পূজিত। আমরা কেন তাকে নিয়ে টানাটানি করি? তিনি তো আমাদের নন। আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবন ও চরিত্র আর তকদীরকে সুন্দর, বরকতময়, পবিত্র ও রহমতের বারিধারায় সিক্ত করার মতো সর্ব শক্তিমান আল্লাহ যখন আছেন, তখন কেন বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মীর শরণাপন্ন হই? লক্ষ্মীতো নিজেই স্বাধীন নন, তিনি অন্যের স্ত্রী, তিনি কতোটুকু আমাদের দিতে পারেন?

সর্বশক্তিমান আল্লাহ চান তার জিকির, তার এবাদত, তার কাছে আত্মসমর্পিত মোনাজাতরত বান্দাহর হাত, তিনি চান তার করুণার কাঙালদের। তাকে ছেড়ে কেন আমরা বিষ্ণুর স্ত্রীকে সৌভাগ্যের মালিক মনে করি? কেন আমরা লক্ষ্মীর নাম জপ করি? এমন আত্মভোলা ও পরের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্তদের নাম যতোই ইসলামী হোক না কেন, ইসলামের নজরে ওরা শুধু জাহেল মুর্খই নয়, ওরা মুনাফিক এবং ইসলামের দুশমন। ওরা লক্ষ্মীর অনুসারী, আল্লাহর রহমত পাওয়ার অযোগ্য। যারা না জেনে, বেখেয়ালে 'লক্ষ্মী'কে কথায় ও লেখায় আনেন, তাদের তওবা করে ভবিষ্যতের জন্য লক্ষ্মী পূজা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।

লীলা

বিভিন্ন অভিধানে অভিন্ন যে অর্থ লেখা আছে, তা হচ্ছে এই, লীলা অর্থ ক্রীড়া, কেলি, প্রমোদ, বিলাস, ভাবভঙ্গি, হাবভাব ইত্যাদি। দেবতার কার্যকলাপ যা বোধগম্য এবং বোধগম্য নয়, সবই লীলা। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়, কে বোঝে তোমার লীলা লীলাময়ী তারা। যেমন কৃষ্ণের নরলীলা, জীবলীলা, অবলীলা ইত্যাদি। 'লীলা' যুক্ত হয়ে যেসব শব্দের সৃষ্টি, তাহলো লীলা কমল, লীলা পদ্ম, লীলা কানন, লীলা ক্ষেত্র, লীলাভূমি, লীলা চঞ্চল, লীলাবতী, লীলা বিলাসবতী, লীলাময়ী, লীলায়িত, লীলায়িতা, লীলাস্থলী প্রভৃতি শব্দ। এসব শব্দ গঠিত হয়েছে লীলাকে সামনে নিয়ে। ভিন্ন শব্দ

www.pathagar.com

প্রথমে বসে, তারপর লীলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়েছে, তাহলো তাণ্ডবলীলা ও ধ্বংসলীলা প্রভৃতি শব্দ। এখানে দুটি কথা প্রণিধানযোগ্য। একটি হলো এই, লীলাতে যে অর্থ প্রকাশিত, এ অর্থের সঙ্গে তাণ্ডবলীলা বা ধ্বংসলীলার তো কোনো সম্পর্ক নেই। একদিকে তাণ্ডব অন্যদিকে লীলা, একদিকে ধ্বংস অন্যদিকে লীলা, এ কেমন করে হতে পারে? তাণ্ডবলীলা, ধ্বংসলীলা শব্দ আমরা ব্যবহার করতে পারি, যদি স্বীকার করি যে, এ সব লীলা দেবতার দ্বারা সংঘটিত। তাণ্ডব অর্থ নৃত্য। তণ্ডুমুনি-প্রবর্তিত নৃত্য। পুরুষের নৃত্য, উদ্দাম নৃত্য, শিব তাণ্ডব, বন্যার তাণ্ডব, তাণ্ডবলীলা-এ সবই প্রলয়কালীন শিবের উদ্দাম নৃত্য। মুসলমানরা কি তা বিশ্বাস করতে পারে? ধন-প্রাণ বিনাশী এ অবস্থাকে আমরা তাণ্ডব বলতে পারি না।

দ্বিতীয় কথা হলো, লীলার যে সব অর্থ অভিধানে আছে, তা ক্রীড়া, প্রমোদ, যৌন কেলি, দেবতার কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই লীলা হোক না ভূমি (লীলাভূমি) বা লীলা ক্ষেত্র, তা মুসলমানরা গ্রহণ করতে পারে না। লীলাযুক্ত শব্দগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে, যদি আমাদের জিহ্বা ও কলমকে পবিত্র রাখতে চাই।

সূর্য সন্তান

হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী সূর্যও এক দেবতা। এ দেবতার তিন পুত্র সন্তান : শনি, যম ও কর্ণ। সূর্যের তিন মেয়ে : যমুনা, তপতী ও বিদ্যুৎ। সূর্য বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন রবি, ভানু, ভাস্কর, আদিত্য, দিবাকর, দিনমণি, তপন, মার্তন্ড, অর্যমা, অর্ক, পূষা, সবিতা, সূর, প্রভাকর, বিভাবসু, বিবস্বান, মিত্র ও মিহির। মুসলমানদের মধ্যে যারা গর্ব করে সূর্য সন্তান বলে দাবি করেন বা যারা অন্যদের সূর্য সন্তান বলে পরিচয় দেন, তাদের দাবি বা পরিচয়ে সূর্য দেবতাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করেন। অযোধ্যার পৌরাণিক রাজ বংশের সদস্যরা নিজেদের সূর্য বংশীয় বলে দাবি করতেন। আমাদের 'সূর্য সন্তান'রা কি সেই বংশের সন্তান? মুসলমানরা কি জেনে-শুনে নিজেদের সূর্য দেবতার সন্তান বা

www.pathagar.com

সূর্য কন্যা পরিচয় দিতে পারেন? অগ্নিপুরুষ আর অগ্নিকন্যাও অনুরূপ এক ভুয়া ও অপসংস্কৃতিমূলক দাবি (অগ্নিকন্যা দ্রষ্টব্য)।

সূর্য একটি গ্রহ। সে আল্লাহর সৃষ্ট একটি গ্রহ মাত্র। সৃষ্টির কল্যাণে এর সৃষ্টি। এর বংশ বিস্তারের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। সূর্যের স্ত্রী-পুত্র পরিবার কিছুই নেই। সূর্যকে দেবতা জ্ঞান করা অর্থহীন ও অযৌক্তিক। কোন মুসলিম সন্তান কখনো সূর্যের সন্তান দাবি করতে পারে না। এ কবিরা গুণাহ।

সতী সাধ্বী

আমরা বলি, তিনি একজন সতী সাধ্বী নারী। সতী হলেন দক্ষ কন্যা ও শিব পত্নী। সাধ্বী অর্থ পতিব্রতী নারী। হিন্দুদের মধ্যে যখন সহমরণ প্রথা চালু ছিল, তখন যে সব নারী স্বামীর শবের সঙ্গে একই চিতায় আরোহণ করে স্বেচ্ছায় জীবন্ত পুড়ে মরতো, তাদের বলা হতো সতী সাধ্বী নারী। সাধারণত সতী বলা হয় সেই নারীকে, যে নারী বিয়ের আগে কুমারীত্ব হারায়নি। দক্ষ কন্যা বা শিব পত্নী কুমারীত্ব রক্ষা করেই স্বামী গৃহে গিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি নামে যেমন সতী, কর্মেও সতী। সতী সাবিত্রী শব্দও প্রচলিত, অর্থাৎ সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী স্ত্রী।

মুসলমান নারীদের মধ্যে সতী-অসতীর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত কুমারীত্ব রক্ষা করতেই হয়। যারা রক্ষা করে না, তাদের জন্য রয়েছে শরীয়তের শাস্তি। সতী বাছাইয়ের ব্যবস্থা মুসলমানদের মধ্যে নেই। কোন কোন ধর্মে সতীত্ব হারানোতেই পূণ্য লাভ। অতএব মুসলিম সমাজে সতী শব্দটাই গ্রহণযোগ্য নয়। সতী সাধ্বী বা সতী সাবিত্রী মুসলমানদের কোন রূপ প্রয়োগে আসা উচিত নয়।

www.pathagar.com

সতীর্থ

সতীর্থ অর্থ একই সময়ে একই গুরুর ছাত্র। সমান+তীর্থ (গুরু) সতীর্থ। তীর্থ শব্দের এক অর্থ গুরু। এবার চিন্তা করুন, সতীর্থ উচ্চারণের মাধ্যমে বা লেখার মাধ্যমে আমাদের বৈদিক সংস্কৃতির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর আমরাও ভাষা-সংস্কৃতির পথ ধরে সে গন্তব্যেই যাচ্ছি। আমরা সতীর্থের পরিবর্তে সহপাঠী বলতে পারি। আরো কঠিন ভাষায় যদি বলতে হয় তাহলে বলতে পারি সহাধ্যায়ী।

স্নাতক

বৈদিক যুগে যে ছাত্র বা শিষ্য গুরুগৃহে বিদ্যা শিক্ষান্তে ব্রহ্মচর্য সমাপ্তিসূচক শাস্ত্রোক্ত পবিত্র জলে বা নদীতে স্নান করার পর স্নাতক উপাধি দ্বারা ভূষিত হতো, তারাই হতো স্নাতক। এর মানে ধর্ম জ্ঞান অর্জন করে শাস্ত্রীয় বিধান মতো স্নান করে পাপ মুক্ত হয়েছে এবং বিদ্বান বলে পরিগণিত হয়েছে অর্থাৎ সে স্নাতক হয়েছে। আজকাল আমরা কলিকাতার বাবুদের অনুকরণ করতে গিয়ে গ্রাজুয়েট অর্থে স্নাতক শব্দ গ্রহণ করেছি। পরিতাপের বিষয়, আমরা বৈদিক স্নাতক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হয়েছি। স্নাতক না হয়ে গ্রাজুয়েট থাকলে অসুবিধা কোথায়?

হরিলুট

এ শব্দটি মুসলমানরা প্রায়ই ব্যবহার করেন। হরি হলেন হিন্দু শাস্ত্র মতে নারায়ণ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, যম, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, সিংহ, অশ্ব ইত্যাদি। হরিলুট হচ্ছে হরি-সংকীর্তনের পর প্রসাদী বাতাসা তরুণদের বা ভক্তদের মধ্যে ছিটিয়ে বা ছড়িয়ে দেয়া। এই হলো হরিলুট শব্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। মুসলমানদের হরি বলতে কেউ নেই। আর নেই বলেই প্রাসাদী বাতাসা তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। এ কারণেই মুসলমানরা এ শব্দের ব্যবহার কথায় বা লেখায় ঈমান-আক্বিদাগত কারণেই করতে পারে না।

www.pathagar.com

হত্যাযজ্ঞ

হত্যাযজ্ঞ তো একটা সাধারণ শব্দ হিসেবে বাংলা ভাষী হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সকলেই ব্যবহার করেন। যজ্ঞ হচ্ছে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগের অনুষ্ঠান। যজ্ঞ শব্দটি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের পূজার শব্দ। যজ্ঞ থেকেই যজ্ঞকুণ্ড (হোমাগ্নি জ্বালাবার জন্য যজ্ঞস্থলে যে গর্ত খনন করা হয়), যজ্ঞ ধূম (হোমাগ্নির ধোঁয়া), যজ্ঞ পশু (যজ্ঞে বলি দেয়ার উপযোগী প্রাণী), যজ্ঞ পাত্র (যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় বাসন-কোসন), যজ্ঞেশ্বর (নারায়ণ বিষ্ণু), যজ্ঞবেদী (যজ্ঞস্থলে যে উচ্চ বেদী প্রস্তুত করা হয়), যজ্ঞ ভূমি ইত্যাদি শব্দের উদ্ভব। আমরা হত্যাযজ্ঞ বর্জন করে হত্যাকাণ্ড ব্যবহার করতে পারি।

হন্যা বা হন্যে

কোন বিশেষ প্রয়োজনে যখন একজন অন্যজনকে এদিক-ওদিক তালাশ করেও পায় না, তখন তৃতীয় ব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাবে বলে, আর বলো না ভাই, আমি মফিজকে হন্যে হয়ে খুঁজছি।

হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজির এমন বাক্য আমাদের সমাজে বেশ চালু। কিন্তু তারা জানেন না, এই হন্যে শব্দের উদ্ভব ও উৎস কি, যে ভাষার শব্দ এটি, তার জন্ম ইতিহাস ভিন্ন। যারা হন্যে শব্দ প্রয়োগ করে বাক্য তৈরি করে লেখেন বা বলেন, তারা এ শব্দকে পেরেশান অর্থে গ্রহণ করেন। কিন্তু এই পেরেশানীর মূল কি, তাতো জানতে হবে।

হন্যে শব্দট সংস্কৃত ভাষার একটি শব্দ। এই শব্দের জন্ম হয়েছে কুকুর-কুকুরীর যৌন অস্থিরতার এক বিশেষ পর্যায়কে বুঝাবার জন্য। কুকুর যখন কুকুরীর পিছনে যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির লক্ষ্যে দৌড় দেয় এবং কুকুরী খেলাচ্ছলে হোক বা ধরা না দেয়ার কারণে হোক দৌড়াতে থাকে অথবা কুকুরী কোথাও লুকিয়ে আছে, কুকুর এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছে, খুঁজে পাচ্ছে

www.pathagar.com

না, খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে পড়েছে, কুকুরের এই অবস্থাকেও হন্যা বা হন্যে বলে।

হন্যা বা হন্যের সাধারণ অর্থ হয় এই, হনন বা আক্রমণ করার জন্য ক্ষিপ্তভাবে ইতস্তত ধাবমান, খেপা কুকুর। এক ভাই অন্য ভাইকে খুঁজছে একটি সুসংবাদ দেয়ার জন্য, এখানেও 'হন্যে হয়ে খোঁজার' প্রয়োগ কেমন করে হতে পারে? 'হন্যে' কুকুরের বা দুশমনের জন্য শব্দ, মানুষের বা বন্ধুত্বের কোন শব্দ নয়। পশু-পাখীর বিভিন্ন ডাক বা আওয়াজের যেমন পৃথক পৃথক নাম আছে, তেমনি তাদের জীবন ধারার কোন কোন অবস্থাও বিশেষ বিশেষ শব্দে বিশেষিত হয়ে থাকে। হায়না ও কুকুরের জন্য হন্যা বা হন্যেও তদ্রুপ একটি শব্দ, এ শুধু তাদের জন্য। মানুষ তা ব্যবহার করলে ঐ পশু প্রকৃতির অনুসরণ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

তিনটি শব্দের ভুল ব্যবহার : উৎসারিত, প্রেক্ষিত ও ফলশ্রুতি। শব্দগুলো অপসংস্কৃতিমূলক শব্দ নয়, তবে অপপ্রয়োগের কারণে শব্দের অর্থ বিকৃতি ঘটছে। আমি এখানে তিনটি শব্দ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

উৎসারিত

আমাদের মধ্যে অনেক লেখক আছেন, তারা 'উৎস' শব্দটি লেখার দরকার মনে করলে এর সাথে মিল রেখে 'উৎসারিত' শব্দ ব্যবহার করবেনই। উৎসের সঙ্গে উৎসারিত শব্দের একটা ছন্দ-মিলন আছে, তাই উৎসের সঙ্গে উৎসারিত শব্দের মধু মিলন ঘটিয়ে থাকেন। যারা এমন করেন, তারা জানেনই না, 'উৎসারিত' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

উৎসারণ অর্থ দূরীকরণ, অপনয়ন, ঊর্ধে উৎক্ষেপণ চালন। উৎসারিত (বিশ) অর্থ দূরীকৃত, উৎক্ষিপ্ত, চালিত। শব্দের অর্থ না জানার কারণে অনেকে নির্গত, উৎপাদন, জন্মলাভ অর্থে উৎসারণ বা উৎসারিত শব্দের ব্যবহার করে থাকেন। দূরীকরণ, অপনয়ন, উৎক্ষেপণ-এর যে অর্থ তা কি নির্গত, উৎপাদন আর জন্মলাভ শব্দের একই অর্থ? দূরীকৃত আর নির্গত যদি একই অর্থবোধক হতো, তাহলে উৎস থেকে উৎসারিত অর্থ শব্দের যথপোযুক্ত প্রয়োগ হতো। বরং উৎসাদন আর উৎসারণ প্রায় একই অর্থ বহন করে। সুতরাং উৎস থেকে উৎসারিত যারা লেখেন নির্গত অর্থে, তারা উৎসারণের ভুল প্রয়োগ করেন।

প্রেক্ষিত

প্রেক্ষিত (বিণ) অর্থ প্রেক্ষণ বা দর্শন করা হয়েছে এমন। (সংস্কৃত, প্র+ঈক্ষ্+ত= প্রেক্ষিত)। প্রেক্ষিত শব্দের এই একটি মাত্র অর্থ অভিধানে আছে, দ্বিতীয়টি নেই।

এই শব্দ থেকে যতো শব্দ হতে পারে, সব শব্দেরই একই অর্থ 'দর্শন'। যেমন প্রেক্ষক অর্থ দর্শন, প্রেক্ষণ অর্থ দর্শন, দৃষ্টি ও চক্ষু। প্রেক্ষণীয়-দেখিবার যোগ্য, প্রেক্ষা অর্থও দর্শন, পর্যবেক্ষণ। প্রেক্ষালয় বা প্রেক্ষাগৃহ, ছায়াছবি দেখার ঘর, রঙ্গালয়।

www.pathagar.com

যারা পরিপ্রেক্ষিত অর্থে 'পরি' বাদ দিয়ে সংক্ষেপে 'প্রেক্ষিত' করেন, তারা মূল শব্দটির সংক্ষেপ অংশ ব্যবহার করতে গিয়ে ভিন্ন অর্থের দিকে যে চলে যান, তা কি তারা লক্ষ্য করেছেন? তারা বলবেন, 'প্রেক্ষিত' আমরা ব্যবহার করে থাকি পরিপ্রেক্ষিতের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে। তাদের কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে, সব শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হয় না। সংক্ষিপ্ত করতে গেলে মূল শব্দের অর্থ থাকে না। প্রেক্ষিত আর পরিপ্রেক্ষিত শব্দ দিয়েই তো বুঝতে পারলেন। পরিপ্রেক্ষিত শব্দের অর্থ হলো পটভূমি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, Perspective। এ সব অর্থ তো প্রেক্ষিতে নেই। সুতরাং আমরা পটভূমি অর্থে যে 'প্রেক্ষিত' ব্যবহার করি, তা ভুল এবং অশুদ্ধ ব্যবহার করি।

ফলশ্রুতি

চেষ্টা, সাধনা, অধ্যবসায় ও কর্মের যে ফল বা ফলাফল তা শ্রবণ করা। শ্রুতি অর্থ শ্রবণ। ফলশ্রুতি অর্থ যে ফল শ্রবণ করা হয়। যেমন জনশ্রুতি। যারা ফলাফল বা ইংরেজি Result অর্থে ফলশ্রুতি শব্দটি ব্যবহার করেন, তাদের ব্যবহার ভুল। ধাতুগত অর্থে, সাধারণ অর্থে এবং আভিধানিক অর্থেও তারা ভুল ও অশুদ্ধ ব্যবহার করেন। এ শব্দ বিশুদ্ধ অর্থে ব্যবহার হওয়া উচিত।

উপসংহার

এমন কিছু শব্দ আছে যা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন ধারা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা জিয়াফত, দাওয়াত বাদ দিয়ে নিমন্ত্রণ খেতে যাই। গোশত শব্দের ব্যবহার তো হারিয়েই যাচ্ছে। গোশতের পরিবর্তে মাংস ব্যবহার হচ্ছে। এক কালে রান্না তরকারীর নাম ছিলো ছালন বা ছালুন, তাও প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলায় দোকানে গিয়ে বলতাম, বয়দা বা আন্ডা আছে কি? দোকানী বুঝতো কি চাই। এখন ডিম চালু হয়েছে। বয়দা হচ্ছে আরবী বাইদাতুন শব্দের বাঙালি উচ্চারণ। মাসের তারিখ আমরা আগে লিখতাম ১লা (পহেলা), ২রা (দোসরা), ৩রা

www.pathagar.com

(তেসরা), ৪ঠা (চৌঠা), ৫ই (পাঁচই), ২০শে, ৩০শে এভাবে। এই রীতির লেখা বা বলার মধ্যে মুসলমানী গন্ধ থাকার কারণে এখন কলিকাতার বাবুরা চালু করেছেন ১ জানুয়ারি, ২ জানুয়ারি, ৩ জানুয়ারি ইত্যাদি কায়দায় লেখার নিয়ম। আমরা তা অনুসরণ করছি। আশীর্বাদ অভিশাপ দখল করছে দোয়া বদদোয়ার জায়গা।

করমর্দন (Handshake) মানে হাত মর্দন। 'কর' অর্থ হাত। আমরা তো হাত মিলাই, একে অন্যের হাত তো মর্দন করি না। তবুও বলা হয় করমর্দন। তবে একজন অন্যজনের হ্যান্ডস্যাক (হাত ঝাকুনি) দিয়ে থাকেন। তাই হ্যান্ডস্যাক বলা হয়। করমর্দনের চেয়ে হ্যান্ডাস্যাক অর্থের দিক দিয়ে অনেক সুস্পষ্ট। মুসলমানরা মুছাফা বললে বা করলে মর্দন বা ঝাকুনির ঝামেলায় যেতে হয় না। দু'বাহু বাড়িয়ে মুছাফা করলে মুছাফার হাত বুকে লাগালে মানসিক প্রশান্তিও পাওয়া যায়। করমর্দন সংস্কৃতি আর হ্যান্ডাস্যাক বা হাত ঝাকুনি সংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা আমাদের মুছাফা সংস্কৃতিতে প্রত্যাবর্তন করা কি উত্তম নয়? সমাজে নিমকহারাম শব্দ চালু থাকলেও নিমক উচ্চারণই নেই, নিমকদামও নেই। এরপরও নিমকপুরী আছে, নিমকী আছে, নিমকহালাল কথাও আছে, কিন্তু শুধু নিমক নেই।

আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলার মুসলিম সমাজে হিন্দু সম্বোধন-সংস্কৃতির প্রভাব এতো বেশি যে, দু'পর্যায়ে স্বাধীনতা লাভের অর্ধ শতাধিক বছর পরও ছোট চাচা, বড় চাচা, বুবু-বুবুজান সম্বোধনের পরিবর্তে কাকা-জেঠা, দিদি, বড়দা, ছোটদা সম্বোধন এখনো চালু আছে। মুসলিম শিশুর নামকরণে এখন তো হিন্দু দেব-দেবীর নাম এবং সংস্কৃত ভাষার যে সব নাম হিন্দুরা তাদের শিশুদের নাম রাখে, এসব নাম রাখছেন মুসলিম মা-বাবারা। এখনো শিশুর বাবার নাম জানলে বোঝা যায়, শিশুটির ধর্ম-পরিচয়, কিন্তু ৪০/৫০ বছর পর এই শিশু যখন বাবা বা মা হবে, তখন তাদের সন্তানের নামও তাদের নামকরণের ঐতিহ্যে রাখা হবে। সে সময় শিশুর জাত পরিচয় জানতে হলে দাদার নাম জানতে হবে।

www.pathagar.com

অনেক অপসংস্কৃতিমূলক শব্দ মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। শুধু প্রবেশই করেনি, আমাদের বলার ও লেখার ভাষায় মিশে আছে। আমাদের বলার ও লেখার ভাষাকে যদি আমরা আমাদের ঈমান-আক্বিদা অনুযায়ী পরিশুদ্ধ করতে চাই, তাহলে এসব শব্দ আমাদের অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। প্রয়োজনে বাদ দিতে হবে এবং আমাদের শব্দ ভান্ডার থেকে শব্দ এনে যেখানে যে শব্দের স্থান শূন্য হবে, তা পূরণ করতে হবে। এদিক দিয়ে বিপ্লবী ভূমিকা রেখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং ফররুখ আহমদ। তাদের পর বাংলা সাহিত্যে তৃতীয় জনের আবির্ভাব এখনো ঘটেনি। আমি মোটামুটিভাবে একটা হিসাব কষে দেখেছি, ৫০/৬০টি শব্দের ব্যবহারে যদি আমরা ঈমানী সচেতনতার পরিচয় দিতে পারি, তাহলে শব্দ সংস্কৃতির ছোবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবো। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম লেখক, বক্তা ও শিক্ষিতজনরা যদি নিজস্ব পরিভাষা ব্যবহারে আন্তরিকতার সাথে যত্নবান হন, তাহলে বরং বিভিন্ন ভাষাভাষী ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতি আরো মজবুত ও মধুর হবে এবং মুসলমানরাও ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ছোট-বড় অনেক গুণাহ থেকে বেঁচে যাবেন।

আল্লাহ আমাদের সে তৌফিক যেন দেন, তার কাছে রইলো এই মোনাজাত। তবে বান্দাহ যদি নেক নিয়তে সচেতনতার ভূমিকা রাখে, তাহলে আল্লাহর মদদও আসে।

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত বই

১। অপসংস্কৃতির বিভীষিকা (১ম খন্ড)
২। জহুরীর জাম্বিল (১ম খন্ড)
৩। জহুরীর জাম্বিল (২য় খন্ড)
৪। খবরের খবর
৫। ধূম্রজালে মৌলবাদ
৬। প্রেস্টিজ কন্‌সার্ণড
৭। মস্তানদের জবানবন্দী
৮। তিরিশ লাখের তেলেসমাত
৯। ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন
১০। তথ্য সন্ত্রাস
১১। স্বজন যখন দুশমন হয়
১২। শব্দ সংস্কৃতির ছোবল
১৩। পরবর্তী বই অপসংস্কৃতির বিভীষিকা (২য় খন্ড)

প্রাপ্তিস্থান
তাসনিয়া বই বিতান
৪৯১/১,ওয়্যারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।